

চিত্তরঞ্জন দাশের কাব্যসংগ্রহ

চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮
জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদশিল্পী :
পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩। অক্ষর-বিন্যাস : ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা ৭৩। মুদ্রক : কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২।


Ranjan

সূচিপত্র

ভূমিকা :

এক

'দেশবন্ধু কবিতা লিখতেন? বুঝেছি, একটা বিশেষ বয়সে সব বাঙালিই যেমন কবিতা লেখে, সে তবে সেইরকমই কিছু!' এখনকার কবিতা-পাঠকের কাছ থেকে এমন কৌতুক-মেশানো বিস্ময় ছাড়া আর-কোন প্রতিক্রিয়া কি আশা করি আমরা? এর থেকেও মর্মান্তিক নামজাদা সাহিত্য-ইতিহাসকারদের অবজ্ঞার মনোভাব : 'নারায়ণ বাহির করিবার কিছু আগে হইতেই চিত্তরঞ্জন ভক্তকবিদের দলে ঢলিয়া পড়েন এবং তাঁহাদের চাপে রবীন্দ্রবিরোধীদের পৃষ্ঠপোষক হন। চিত্তরঞ্জন এই কাব্যগ্রন্থগুলি রচনা করেন—'। গ্রন্থগুলির একটি তালিকার চেয়ে বেশি-কিছু চিত্তরঞ্জনের প্রাপ্য বলে এই প্রবাদ-প্রতিম সাহিত্য-ইতিহাসকারের মনে হয়নি। দ্বিতীয় একজন[১] আবার এই বইগুলির নামোল্লেখেরও প্রয়োজন দেখেননি, যদিও 'নারায়ণ'-এর রবীন্দ্রবিরোধিতার[২] ইতিবৃত্তের জন্যে তিনি যথেষ্ট জায়গা দিতে পারেন। তবে রবীন্দ্র-বিরোধিতার জন্যে নয়, তথাকথিত রবীন্দ্র-অনুকরণই বোধহয় চিত্তরঞ্জনকে উপেক্ষার প্রকৃত কারণ। তিনি রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকারী, এমন ধারণাই বাংলা কবিতার অপেক্ষাকৃত মনস্ক পাঠক-অধ্যাপক-সমালোচক মহলে প্রচলিত। রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও অনুকরণের এক অদ্ভুত ঘূর্ণাবর্তে পড়ে চিত্তরঞ্জন শুধু কবিতা হিসেবেই তাঁর কবিতার মনোযোগী পাঠ আশা করার অধিকারটুকুও যেন হারিয়েছেন। ফলে রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা যাই হোক, কবি চিত্তরঞ্জন শুধু বিস্মৃতই নন, বোধহয় মৃত।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। একথা ঠিক, জীবনের শেষ দশ বছর চিত্তরঞ্জন কবিতা লেখেননি। কিন্তু তাই বলে তাঁর কবি-জীবন নিতান্ত স্বল্পায়ু নয়। কৈশোরক কবিতার কথা যদি বাদ দিই, তবু আঠেরোশো তিরানব্বই-এ ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরার পর থেকে উনিশশো পনেরোয় 'কিশোর-কিশোরী'র প্রকাশ পর্যন্ত কবিতা তাঁর প্রাণ-মন জুড়ে ছিল। প্রথম দিকে যখন আইন-ব্যবসায় পশার তেমন জমেনি তখন রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে কবিতা পাঠ ও আলোচনার আসরে তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত ও উৎসাহী। রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' ও 'অন দি এজিজ অভ টাইম'-এ আছে সেইসব আসরের কথা। আদালত থেকে সোজা চলে আসতেন অগ্রজ কবির বাড়িতে। মৃণালিনী দেবীর করা লুচি-মাংসের সঙ্গে মিশতো কাব্যরসের ভিয়েন। পরবর্তীকালে 'খামখেয়ালি'র আসরেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট দৃশ্যমান। সমকাল যে কবি হিসেবে তাঁকে উপেক্ষা করেছিল সে-কথাও বলা চলে না। বরং উলটোটাই সত্য। জনপ্রিয়তার নিরিখকে যদি নির্ভরযোগ্য বলে মনে নাও করি, তবু যে-কবির জীবৎকালেই তাঁর প্রায় সব কটি বইয়েরই একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় (গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য), তাঁর স্বীকৃতি নিয়ে সন্দেহ থাকে না। তাঁর কবিতা নিয়ে উচ্ছ্বসিত মানুষেরও অভাব ছিল না। অরবিন্দ ঘোষ *সাগরসংগীত* ইংরিজিতে অনুবাদ করেছিলেন। অন্যকিছু কবিতার ভাষান্তর করেছিলেন প্রাচ্যবিদ, বাংলা-জানা সাহেব জন আলেকজান্ডার চ্যাপম্যান। মৃত্যুর পর কিছুদিন অটুট থাকলেও তাঁর কবি-খ্যাতি কিন্তু খুব দ্রুতই অন্তর্হিত হয়েছিল। স্বাভাবিক

প্রক্রিয়ায় কিছুদিন রাহুগ্রস্ত থাকার পর অনেক কবির যে পুনর্বাসন ঘটে পাঠকের দরবারে তেমনটা ঘটেনি তাঁর ক্ষেত্রে। উনিশশো সাতান্নয় যখন কবিকন্যা অপর্ণা দেবী তাঁর কবিতাবলীর সংকলন করেন *কবি-চিত্ত*'এ, তখন বাঙালি পাঠকের মনোভাবে বোধহয় কৌতূহল এবং পুণ্যস্মৃতি-তর্পণের তাগিদ ছিল সমান-সমান, ছিল না শুধু কোন সজীব কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে পুনঃপরিচয়ের আবেগ বা প্রস্তুতি।

তবে কি কোন প্রকৃত বিষয়বস্তুর বা নিজস্ব ও গভীর অনুভূতির অভাব অথবা কবিতাকে অনুসন্ধান বা জীবন-বীক্ষার মাধ্যম করতে চিত্তরঞ্জনের অক্ষমতাকেই দায়ী করবো? প্রতিভায় তারতম্য-ভেদ অবশ্যই আছে, কিন্তু তাঁর কবি-প্রতিভা ছিল না একথা বললে অন্যায় করা হয়। কবি হতে হলে যে দুটো জিনিস চাই, প্রকৃত অনুভূতি ও ভাষার সম্পর্কে সূক্ষ্ম বোধ, তা যে তাঁর ছিল তার প্রমাণ অচিরেই পাব। উপরন্তু, কবিতাকে তিনি কখনও ছেলেখেলার বস্তু বলে ভাবেননি। কবিতার কাছে ও কবিতা নিয়ে তাঁর দাবির প্রকাণ্ডতায় বিস্মিত হতে হয়। কবিতা চিত্তরঞ্জনের চোখে উচ্চতম সাধনারই অঙ্গ। মানুষের জীবনে সান্ত ও অনন্তের যে কোলাকুলি—তাঁর ভাষায় 'মহামিলনমন্দির'—তাই কবিতার বিষয়। জীবনের অনন্ত-মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখাই কবির কাজ। কবিতা নিয়ে যিনি এমন করে ভাবতে পারেন তাঁকে আর যাই হোক বিষয় বা অনুভবে দরিদ্র বলা যায় না। তিনি কবিতায় কি করতে চান তা নিয়ে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট ও স্বচ্ছ. তাঁর কবিতার সঙ্গে কবিতা বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলোকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) যদি মিলিয়ে পড়ি তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ-কবিতার শেকড় আছে একটা সামগ্রিক জীবনবোধের আধারে। যিনি লিখতে পারেন : 'কবিতা কবির আশা তাই তারে টানে'—তাঁর কাব্যচর্চা শৌখিন বিলাস বা অগভীর উচ্ছ্বাস কোনটাই হতে পারে না।

অস্বীকার করি না চিত্তরঞ্জনের কবিতায় বিষয়ের পরিধি ও অনুভূতির জগৎ সীমায়িত—উপমা-চিত্রকল্পে বৈভব কম, ভাষা ও ছন্দের জৌলুসও উজ্জ্বল নয়। কিন্তু এই সংকীর্ণতা স্ব-আরোপিত, তাঁর কাব্য-তত্ত্বেরই ফলিত রূপ। পরিধির সংকীর্ণতা তিনি ঘোচাতে চেয়েছিলেন অনুভবের গভীরতায়। আর যাকে তাঁর সাদামাটা ভাষা বলে মনে করছি তার মধ্যেও হয়তো লুকিয়ে আছে কবিতায় ভাষা-ব্যবহারের কোন নিজস্ব রীতি। শেষপর্যন্ত প্রচলিত মতামতের ভার এবং কবিতা-পাঠকের সংবেদনের জাড্যই কবি চিত্তরঞ্জনকে আড়াল করার জন্যে দায়ী। তাই সময় এসেছে, এখনকার পাঠকের কাছে আরেকটু ধৈর্য ও মনস্কতা আশা করে এতদিনের অবহেলা ও অনাদরের ধুলো সরিয়ে কবিতাগুলোকে একটু উলটে-পালটে দেখার।

দুই

উনিশ-বিশ শতকের বাংলা কবিতা-পাঠে রবীন্দ্রনাথ এখনও আমাদের মানদণ্ড অথবা আলম্ব। তাঁর অব্যবহিত পরের কবিরা তাঁর থেকে কতটা দূরে সরে যেতে পেরেছেন তাই দেখে বিচার করি তাঁদের কবিতার সার্থকতা। রবীন্দ্র-প্রভাবের বিরাট প্রচ্ছায়ার সম্পূর্ণ বাইরে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে নেওয়া হয়। 'রবীন্দ্রানুসারী-কবিসমাজ' বা 'রবীন্দ্রবলয়ের কবি' বা এইরকম আরও-কিছু শব্দগুচ্ছ আমাদের সাহিত্য-পরিভাষার অংশ হয়ে আছে। বুদ্ধদেব বসুর* সপ্রতিভ ও স্মরণীয় বিশ্লেষণে তাঁরা হয়ে উঠেছেন, ফরাসিরা যাকে বলে Poetes maudits, অভিশাপগ্রস্ত কবি, রবীন্দ্রনাথের দুর্মর প্রভাব যাঁদের স্বকীয় কণ্ঠস্বর আয়ত্ত

করার পথে দুর্লঙ্ঘ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ বিশ্লেষণ হয়তো মূলত সত্য, তবু প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রে আলাদা করে বিচারের প্রয়োজন তাতে ফুরোয় না। সামান্য-সূত্রে বাঁধতে গিয়ে কোন-কোন কবির কিছু অসামান্য দিককে উপেক্ষা করা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন এমনই একজন কবি।

সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি তাঁর কবিতায় বারবার পাই, প্রথম দিকের কবিতায় তো বটেই, এমনকি পরিণত বয়সের কবিতা 'সাগরসঙ্গীত'এও কয়েকবার। এবং প্রায়শই এগুলোকে অক্ষম প্রতিধ্বনি বলে মনে না করা সমবেদী পাঠকের পক্ষেও শক্ত। 'তোমারেই করিয়াছি সাক্ষী জীবনের' (সাক্ষী, *মালঞ্চ*), অথবা 'শুনেছ কি বিশ্বরাজ বসি স্বর্ণ-সিংহাসনে' (অভিশাপ, *মালঞ্চ*), অথবা *সাগরসঙ্গীত*'এর শুরুতেই 'আজিকে পাতিয়া কান/শুনিছি তোমার গান'-এর মতো পঙ্‌ক্তি এবং 'কৌতুকময়ি', 'রহস্যময়ি'র মতো রাবীন্দ্রিক ঢঙ্-এর সম্বোধন দেখে পাঠকের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া অনুকূল না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রয়োজন আছে এই প্রাথমিক বিরূপতাকে জয় করে ধৈর্য ধরে আরও একটু সামনে, আরও গভীরে যাওয়ার। ওই 'অভিশাপ' কবিতার 'শুনেছ কি বিশ্বরাজ বসি স্বর্ণ-সিংহাসনে' চরণটিই ধরুন। এর পিছনে কাছাকাছি সময়ের লেখা *চিত্রা*'র অন্তর্যামী কবিতার 'শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া আপন সিংহাসনে'-র স্মৃতি নিশ্চয়ই আছে। হয়তো আরও আছে অনেক আগের গান 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত'-র রেশ। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের কবিতায় এর অনুষঙ্গ ও অনুভূতি এত পরিষ্কার অরাবীন্দ্রিক যে প্রভাবের ধারণাটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের দয়ালু ভগবানের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষের হালকা ছোঁয়াও থাকতে পারে চিত্তরঞ্জনের সম্বোধনে। 'সাগরসংগীত'-এর প্রথম চরণদুটিতে বিব্রত না হয়ে যদি পড়ে যাই :

হে অর্ণব! আলো-ঘেরা প্রভাতের মাঝে
এ কি কথা! এ কি সুর!
প্রাণ মোর ভরপুর,
বুঝিতে পারি না তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে!

—তবে দেখবো অনুভূতির পরিমণ্ডল ও প্রকাশের ভাষা-ভঙ্গি কোনোটাকেই বিশেষ করে রবীন্দ্র-অনুকারী বলা যায় না। তেমনই 'ধুলায় ধূসর তার চরণ তলায়' (*অন্তর্যামী* ২২) অথবা 'তোমারে চিনেছি দুঃখ! তুমি রাখ মোরে/আবরিয়া কি অপূর্ব প্রেয়সীর মতো/সংসারের সর্ব সুখ হতে!' (*দুঃখ, মালঞ্চ*)। এই লাইনগুলোর শব্দে ও স্পন্দনে অগ্রজ কবির অনুরণন থাকলেও তাদের ভাবনার আধার মোটেই রাবীন্দ্রিক নয়।

তাই চিত্তরঞ্জনের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি প্রকৃতিতে অনেকটাই বাহ্য ও প্রক্ষিপ্ত। তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের স্বকীয়তা তাতে ঢাকা পড়ে না, অন্তত সৎ পাঠকের কাছে। এটা স্পষ্ট যে তাঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে অথবা কেন্দ্রে রেখে ঘুরছে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মোহ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, এমন দাবি করার প্রয়োজন নেই। তাঁর অনুভূতির এবং তা প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য তিনি বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং মূলত সফল হয়েছিলেন, সেটাই আশ্চর্য। আধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতা প্রকাশে আবেগ, ভাষা, ভঙ্গি, চিত্রকল্প-ইত্যাদির বৈচিত্র্য অনন্ত নয়, তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কবি ও মরমিয়াদের আবেগের প্রকাশ খুব কাছাকাছি চলে আসে। আপাতদৃষ্টিতে বা অগভীর পাঠে একইরকম মনে হলেও চিত্তরঞ্জনের

অন্তর্যামী ও রবীন্দ্রনাথের মনের 'মায়ামুরতি'র মধ্যে যোজনব্যাপী দূরত্ব। রবীন্দ্রনাথের কৌতুকময়ী শুধু সংকীর্ণ অর্থে পরমার্থের পথ-নির্দেশক নয়, কবির সমস্ত সত্তাই তার কাছে বাঁধা, সে তাকে নিয়ে যায় পরিচিত গন্ডি ছাড়িয়ে—কোথায়, কেন, তা তাঁর স্পষ্ট জ্ঞানের বাইরে। তারই ইচ্ছাধীন তাঁর আত্মস্ফুরন ও আত্মপ্রকাশ, কবির উচ্চারণে মেশে তার কণ্ঠস্বর—'তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে/ডুবায়ো ভাসায়ে নয়নের জলে,/নবীন প্রতিমা নব কৌশলে/গড়িলে মনের মতো।' চিত্তরঞ্জনের অন্তর্যামী সাধকের ঈশ্বর। সঠিক পথের দিশা নিয়ে ভক্তের সঙ্গে রঙ্গ করলেও তিনি পথেরই কান্ডারি। যদিও তিনি পরান-বঁধু ও রহস্যময়ী, তাঁর রহস্যময়তা শুধু সৃষ্টির মধ্যে ও ভক্ত-হৃদয়ে ধরা দেওয়া না দেওয়ার অবিরত লীলায়। তাই বলে চিত্তরঞ্জনের অন্তর্যামী-ভাবনা নিছক ধর্মীয়, তার কোন শৈল্পিক আয়তন নেই এমন মনে করলে অবশ্যই গুরুতর ভুল হবে। যদিও বাক্যদল প্রভাহীন, তার মধ্যে দিয়ে তাঁর আভাস জলদের মাঝে ম্লান চন্দ্রোদয়ের মতো ('আপনার গান', *মালা*)—তবু কবি চিত্তরঞ্জনের কাছে কবিতাই তাঁকে ধরার অনন্য উপায় :

সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ী!
দাঁড়াও অন্তর-মাঝে ছন্দে গেঁথে লই।
...
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব।
তুমি কি রবে না সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা!
ছন্দবদ্ধ পরিপূর্ণ নিত্য অচঞ্চলা! (আখ্যা কবিতা, *সাগরসঙ্গীত*)

মানসগঠন ও কাব্যমেজাজের এই পার্থক্য আসলে দু-জনের কবিতার পেছনের ঐতিহ্যের ভিন্নতাই প্রমাণ করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ঐতিহ্য জটিল ও বিচিত্র, তাঁব মনের পশ্চাদভূমি বিশাল। তাতে সংস্কৃত কাব্যের উত্তরাধিকার মিশেছে উনিশ শতকের ইংরিজি গীতিকবিতার সঙ্গে, তাঁর কল্পনায় সন্ধি ঘটেছে ব্রহ্মের নিরাকার উপাসনার সঙ্গে হিন্দুর সাকার-সাধনার, বৈষ্ণব কবিতার প্রেমছবিতে লেগেছে লোক-সংস্কৃতি (যদিও কঠোরভাবে নির্বাচিত) থেকে আসা সুর। তুলনায় চিত্তরঞ্জনের সংবেদনের ঐতিহ্য সংকীর্ণ, যদিও সুনির্দিষ্ট এবং অসংকর। নিজেকে তিনি বাংলার ঐতিহ্য-বাহিত লোকায়ত গান ও কবিতার উত্তরসূরি হিসেবে দেখেছেন। পদাবলী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে শুরু করে রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের সময় পর্যন্ত, কবির নিজের ভাষায় : 'চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্যন্ত'— বাংলার লোকজীবনেব সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কবিতাব ধাবাই তাঁকে অনুপ্রাণিত কবেছে এবং তাকেই তিনি পুনরুদ্ধাব করাব চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে যখন গদ্য লেখায় চিত্তরঞ্জন বাংলা কবিতাব একটা ঐতিহ্য নিজের মতো করে নির্মাণ করেছেন, তখন দেখি তা রবীন্দ্রনাথের তৈরি-করা ঐতিহ্যের থেকে কত আলাদা।

মালঞ্চ-র দ্বিতীয় কবিতা 'রানী'র কথাই ধরি। খেয়াল করে না পড়লে ধরতে পারব না কবিতার আসল ঐশ্বর্যটা কোথায়:

মধুর অধরে তার প্রভাতের প্রভা,
লাবণ্য-ললিত বাহু নিন্দিছে নবনী
নিশ্বাসে চন্দন-গন্ধ, ভালে শুভ্র শোভা,
চরণ-পরশে রক্ত অলক্ত অবনী।

অখন্ড সুন্দর তনু, অনিন্দ্য মূরতি,
গীত-গন্ধ-বর্ণ-ভরা সুধার ভান্ডার!
তারি মাঝে উদ্ভাসিত অনিমেষ-জ্যোতি,
জ্বলন্ত সুন্দর প্রাণ, অনন্ত, উদার!

একে প্রথাগত রূপবর্ণনা অথবা হালকা চালে হৃদয়েশ্বরীর কথা মনে করলে ভুল হবে। এর পেছনে রবীন্দ্রনাথও নেই, নেই ইংরিজি কবিতার ঐতিহ্য। এ কবিতার অনুপ্রেরণা এসেছে একেবারেই আলাদা উৎস থেকে। একটু কান পেতে শুনলেই টের পাই অনেক পেছন থেকে আসা কীর্তনের ধ্বনি, শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনার রেশ। বিশেষ করে 'তনু'র বিশেষণ হিসেবে 'অখন্ড' শব্দটাই বলে দেয় এ-কবিতার শেকড় আছে একেবারেই আলাদা এক ঐতিহ্যের মাটিতে। এটা 'নারায়ণ' প্রকাশের কিছু আগেই হঠাৎ ভক্তিবাদীদের দলে ঢলে পড়ার মতো ব্যাপার নয়।

এই চেতনাই ক্রমশ গভীর ও ব্যাপ্ত হয়েছে। বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সঙ্গে কবির সম্পর্ক বিচার করতে চেষ্টা করলেও দেখি রবীন্দ্রনাথের থেকে চিত্তরঞ্জন অনেকটাই আলাদা। রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছেন ঐতিহ্যের মানবিক প্রকাশে, মানব-প্রেমের আধারে ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ তাঁকে মোহিত করেছিল। চিত্তরঞ্জন কিন্তু ক্রমশই কবিতায় বৈষ্ণব-দর্শন ও তত্ত্বের ভিত্তিটাকেই সাবয়ব করে তোলার চেষ্টা করেছেন। নরনারীর প্রেমলীলা বিশ্বসৃষ্টিতে ভগবানের লীলার প্রতিরূপ, তার মধ্যে তাঁকে স্পর্শ করে মানুষ। আবার তিনিও মানুষের প্রেমে নিজেকে প্রত্যক্ষ করেন, একই সঙ্গে দর্শক ও অংশীদার হয়ে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে নরনারী ও ভগবানের এই লীলা চলছে। তাই কিশোর-কিশোরীর উপ-শিরোনাম, 'তিনের কথা'। রবীন্দ্র-দর্শনের সঙ্গে এই ভাবনার আংশিক ও আপাত সাদৃশ্য যেন দুজনের অনুভবের গভীরতর পার্থক্য ধরতে আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে।

তিন

মালঞ্চ'এর কবিতাগুলোতেই এই ভিন্ন উত্তরাধিকারের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রথম কবিতার বইয়ে বিষয় ও অনুভূতির পরিমন্ডলে কিছু ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য ছিল যা চিত্তরঞ্জন পরবর্তীকালে বাদ দিয়েছেন—যেন স্বেচ্ছায় ছোটো করে এনেছেন তাঁর কবিতার বিষয়ের পরিধি, অনুভূতির পরিসর। এই পরিবর্জন ও উদবর্তন বিশেষ কৌতূহলের।

মালঞ্চ-এ দুটো সুর খুব স্পষ্ট ও আলাদা করে অনুভব করা যায়। প্রথমটি প্রেমের। প্রথম কবিতা 'তোমার প্রেম'-এই প্রেমের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য ও গভীরতার কথা আছে; উপর্যুপরি উপমাগুলোকে শুধু এলোমেলো উচ্ছ্বাসের প্রকাশ মনে করলে নিশ্চয়ই ভুল হবে। তাদের সবকটাকে পূর্বচর্চিত বা ক্লিষ্টও বলা চলে না—প্রেমের সঙ্গে প্রবাসীর মনের তুলনাটা তো চমকে দেওযার মতো। প্রেমের মধ্যেই একটা বৈপরীত্য ও বিক্ষোভ নিহিত আছে; সব মিলিয়ে একটা প্রকাণ্ড অভিজ্ঞতা, কোনো বিশাল ও অজানা লোকে যাত্রার মতো—'সমস্ত হৃদয় তব,/অজানিত নিত্য নব,/বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন!' প্রেমের দোলায়মান ও পরিবর্তনশীল আবেগের কথা আছে একের-পর-এক কবিতায় : 'জাগরণ', 'ঋণী', 'আকাঙ্ক্ষা', 'তাপসী', 'মুক্তি', 'লালসা'। এই অন্তরনাট্যের ভাষক কখনও পুরুষ, কখনও নারী। 'প্রেমচতুষ্টয়'-এ প্রথম-দুটি স্তবক পুরুষের, পরের দুটি নারীর—ফলে একটা দ্বিরালাপের ঢং তৈরি হয়েছে কবিতায়। তারমধ্যে হঠাৎ চমকে ওঠে এক আশ্চর্য চিত্রকল্প, যার বহুস্তরী ঘনত্ব রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়, যদিও তার প্রকাশটা কোনমতেই রাবীন্দ্রিক নয়—

আমার হৃদয়-দেহ গীত-ভরা বীণা
তোমার চুম্বন তাহে চম্পক অঙ্গুলি

আছি মোহ অন্ধকারে তোমাতেই লীনা,—
চকিতে চমকি উঠে সংগীত বিজুলি।

মালঞ্চ'এ প্রেম কামনা-রক্তিম, দেহাতীতের ছায়া কখনো পড়েনি, তা নয়। তবু খুব শীঘ্রই যে আধ্যাত্মিক চেতনা তাঁর প্রেম-ভাবনাকে উদ্‌বর্তিত করে দেবে তা এখনও যৌবনের ধর্মকে স্তব্ধ করেনি।

মালঞ্চ'এর দ্বিতীয় সুরটির চরিত্র এতই আলাদা যে দুটোর মধ্যে কোন সাযুজ্য কল্পনা করা কঠিন। 'আমার ঈশ্বর', 'ঈশ্বর', 'সোহং', 'অভিশাপ' এবং আরও কয়েকটি কবিতায় পাই আর একজন চিত্তরঞ্জনকে, যিনি সমকাল-সচেতন, সমাজ-সচেতন, ঈশ্বরের ঔদাসীন্যে কখনো ক্ষুব্ধ, কখনো ক্রুদ্ধ এবং তথাকথিত ধর্মবেত্তাদের বিরুদ্ধে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে খড়্‌গহস্ত। কবিতাগুলো কিছু উচ্চকণ্ঠ, কোমল ও সুকুমার অনুভূতির জায়গা নিয়েছে ক্ষুরধাব ব্যঙ্গ, শাণিত শ্লেষ। কখনও এই শ্লেষ শাণিত ভাষার শ্লোকে ঝলসে ওঠে :

কাহার চরণে তবে সাজাইছ ডালা?
কারে ভাবি কার গলে পরাইছ মালা?

ঈশ্বরকে উদ্দিষ্ট কবিতায় শ্লেষ দ্রবীভূত হয়েছে অপ্রচ্ছন্ন অনুযোগে ও অভিমানে। প্রচলিত ঈশ্বরের ধারণা তৃপ্ত করে না, তাই নিজস্ব ঈশ্বর তৈরি করার মতো অবিশ্বাস্য সাহসিক কথাও বলতে পেরেছেন চিত্তরঞ্জন। পরবর্তীকালে নজরুলে যে প্রচণ্ডতার সাক্ষাৎ পাই তা তাঁর মধ্যেও ছিল। 'অভিশাপ' কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য আরো বিস্ময়কব। এখানে ঈশ্বরকে ঘিরে একটা নতুন মিথ তৈরির চেষ্টা আছে।

সে-সময়ের প্রেক্ষাপটে এই কবিতাগুলোর আবেদন একেবারেই বৈপ্লবিক। দুঃখের কথা, চিত্তরঞ্জন তাঁর কবিতার এই ধারাটির আর চর্চা কবেননি। মনে হয়, এর কারণ লুকিয়ে আছে তাঁর কবিতার আদর্শ-সংক্রান্ত ভাবনার মধ্যে। কবিতার বিষয় কি হওয়া উচিত তা নিয়ে কিছু ধারণা এই সময়েই তাঁর মনকে অধিকার করেছিল, যদিও তা তিনি প্রকাশ করেছেন অনেক পরবর্তীকালে লেখা প্রবন্ধে। তিনি বারবার বলেছেন বটে 'জীবন লইয়াই কবিতা' এবং জীবন শুধু সংসার অথবা শুধু পরমার্থই নয়, উভয়েরেই মহামিলনমন্দির, তবু জীবনের বহিরাবরণ ও তার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে একটা পার্থক্যও তিনি করেছেন। মানুষের ব্যবহারিক জীবন, তার কেজো জগৎ তার আসল পরিচয় দেয় না, তার অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই কবিতার বিষয়। এর ফলে কবি যেমন অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতাকেই কবিতায় ধরতে চাইছেন তেমনই এ-ধারণার অনিবার্য বিমিশ্র পরিণাম হিসেবে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব, তার পার্থিব দুঃখ-কষ্টের ঘটনাগুলোকে বাহ্য জীবন বলে কবিতা থেকে নির্বাসন দিয়েছেন। *মালঞ্চ*-এ এই দুটি আযতনের মধ্যে একটা সহযোগ প্রায়শই অনুমেয়, কখনও কখনও দৃশ্যমান ('জাগরণ', 'ঋণী')। কিন্তু এরপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পরবর্তী গ্রন্থ *মালা*য় তারা ক্বচিৎ কখনও পরস্পরকে ছুঁয়েছে ('মোছ আঁখি')।

চার

মালার সব কবিতাই তাই প্রেমের কবিতা। কিন্তু সেই প্রেমে এখন অতীন্দ্রিয় ছায়া পড়েছে, তার ব্যঞ্জনা গভীরতর হয়েছে—'তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী' ('প্রেম')—প্রেমের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ছে কোন বিরাট লোকের ইশারা। পরস্পরের বিপ্রতীপ কিছু শব্দ, চিত্রকল্প, ধারণা—প্রভাত-সাঁঝ, আলো-অন্ধকার, জীবন-মরণ, অন্তর-বাহির, সুখ-দুঃখ—সব মিলিয়ে এক আবছায়া

রহস্যময় জগৎ তৈরি হয়েছে যার মধ্যেই ক্ষণে-ক্ষণে সত্যের আভাস মেলে। বিপরীত চিত্রকল্পগুলো একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ, এক অখণ্ড অনুভূতিতে জড়িয়ে আছে। এই জগৎটি চিত্তরঞ্জনের নিজস্ব, তাঁর কবিতায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি উজ্জ্বল আলো নয়।

'প্রেম ও প্রদীপ' এক আশ্চর্য কবিতা। এই কবিতায় ঠিকমতো সাড়া দিতে গেলে প্রথমেই মন থেকে মুছে ফেলতে হবে কবিতায় হামেশাই ব্যবহৃত কিছু শব্দ-উপমা-চিত্রকল্প-প্রতীকের প্রচলিত ও প্রথাগত অর্থ, নিজেদের মুক্ত করে নিতে হবে সংবেদনের অভ্যস্ত ও ধরতাই পদ্ধতি থেকে। আলোক এখানে কখনও উজ্জ্বল করে, আবার কখনও তা অন্তরাল, কখনও বা বন্ধন; যে প্রদীপ কনক কিরণ দেয়, তাই আবার ছায়াও সৃষ্টি করে—কবিতার কেন্দ্রপ্রতিমা প্রদীপটাই কখনও আক্ষরিক, কখনও প্রতীক; অন্ধকারও তাই, একদিকে তা অজ্ঞান ও অনুভবের অভাব-সূচক, অন্যদিকে তাই মহামিলনের পটভূমি। আরও বড়ো আশঙ্কা রয়েছে চিত্তরঞ্জনের রহস্যময়ী প্রতিমাকে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী বা জীবনদেবতার সগোত্র মনে করার। কবিতাটার অনুভূতি ও বুদ্ধিগত জটিল বিন্যাস অনুধাবন করতে না পারলে তার অবিশ্বাস্য মৌলিকতাও আমাদের কাছে ধরা দেবে না।

কবিতার শিরোনাম 'প্রেম ও প্রদীপ'—প্রেম-প্রদীপ নয়। অর্থাৎ কবির কল্পনায় দুটির সম্পর্ক রূপকার্থের থেকেও জটিল। হবেই, কারণ কবিতায় প্রদীপের দ্যোতনাই স্থির নয়, সতত পরিবর্তনশীল। একবার তাকে মনে হয় বাহ্য বর্তিকা, কখনও তার উপর একটা হালকা প্রতীকী ছায়া পড়ে, আবার কখনও মনে হয়, এই ছায়া সরে গিয়ে প্রদীপটি একটি বাস্তব আক্ষরিক প্রদীপ হয়ে উঠলো, আবার পরক্ষণেই হয়তো প্রতীকী ছায়া ঘন হয়ে ওঠে। প্রথম স্তবকেই এই স্তর-পরিবর্তন অনুভব করা যায়—প্রদীপের আলো হয়ে ওঠে বাহ্য অস্তিত্বের প্রতীক, হয়তো সৌন্দর্যেরও, তার আলো আসল সত্তাকে আড়াল করে, দেয় শুধু তির্যক আভাস :

তোমার লাবণ্যমূর্তি পড়ে না আঁখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া!

তবু এই আকর্ষণই ডাক দিতে পারে 'পরাণ-মাঝারে'। তখন প্রয়োজন পড়ে বাইরের প্রদীপ নিভিয়ে অন্তরে দীপ জ্বালার, 'নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার...জ্বালগো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার।' এই অন্তর্দীপনই প্রেম। প্রেম নিয়ে আসে অভাববোধ, আনে অসীমের জন্যে বেদনা—এ প্রেম নিষ্ঠুর। তাই, অদ্ভুত শোনালেও, 'প্রজ্জ্বলিত হৃদি মাঝে, শূন্য সব ঠাঁই।' উচাটন প্রেম মথিত করবে সকল অস্তিত্ব, জীবন হয়ে উঠবে বিরামহীন অনুসন্ধান, 'সকল সুখের মাঝে, সর্ব বেদনায়।' ষষ্ঠ স্তবকে মহামিলনের ক্ষেত্র যে অন্ধকারে ঢাকা তা নিশ্চয় একটা প্রতীকী আয়তন, কিন্তু স্তবকের শেষে যে অন্ধকার দূর হতে চলেছে প্রেমের প্রদীপে তার অর্থ একেবারেই আলাদা :

হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার?

বৈষ্ণব-দর্শনের ভাষায় একে বলতে পারি পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন, কিন্তু এ-কবিতার অপ্রতিরোধ্যতা মানুষী-অনুষঙ্গের জন্যেই। অস্তিত্বের আলো-আঁধারের মধ্যে এই প্রোজ্জ্বল প্রেমই সৃষ্টির প্রথম থেকে মানুষের হৃদয়কে টানছে—যদিও প্রেমের অধীশ্বরী রয়েছেন 'নেত্রাতীত চির অন্ধকার-লীনা'। এই প্রেমের মধ্যে অনন্তের দীপ জ্বালা।

'প্রেম ও প্রদীপ' আরও একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেয়। যেটা চিত্তরঞ্জনের কবিতার টেকনিক-গত অভিনবত্ব। তাঁর কবিতার ভাষায় চমকে দেওয়ার মতো জৌলুস নেই, ছন্দ নিয়েও

কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি (যদিও শুধু আট, ছয় ও দশ মাত্রার অক্ষরমাত্রিক পর্বের বিন্যাসের মধ্যেই অনেক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন), তাই মনে করা সহজ, তিনি কবিতার আঙ্গিক নিয়ে উদাসীন। এক অর্থে সেটা মিথ্যেও নয়, তিনি সচেতনভাবে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেননি—সহজভাবে প্রাণের কথা বলতে চেয়েছেন। চ্যাপম্যান সাহেব ঠিকই ধরেছিলেন : তাঁর কবিতা কবিতা হয়েছে শুধু অনুভবের গভীরতায়—'One thing may certainly be said : there is no dilettantism in Chittaranjan's poetry, it is not an affair of 'felicitous phrases' for their own sake, or of experiments in metre. He sang because his heart was full. That was why all the great poets sang and only when their hearts were full did they sing.'[৪]। কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার দৃষ্টিতে এ-বর্ণনা যথেষ্ট নয়। চিত্তরঞ্জনের কবিতাগুলোর গঠন-প্রক্রিয়াটা বুঝতে চেষ্টা করলে দেখি, বৈষ্ণব পদকর্তাদের যে অতির্যক হার্দ্য উচ্চারণ নিয়ে তিনি এত উচ্ছ্বসিত ছিলেন তাঁর নিজের কবিতা কিন্তু ঠিক সেভাবে গড়ে ওঠেনি। চিত্তরঞ্জনের কবিতা artless নয়, তবে art-কে ঢাকা দেওয়ারও একটা art আছে। লক্ষ করলে দেখি, তাঁর অনেক কবিতাই গড়ে উঠেছে সীমিত-সংখ্যক শব্দ, অল্প-কিছু উপমা-চিত্রকল্প আশ্রয় করে। এমনকি তাঁর অনুভূতি গভীর হলেও পরিসরে বিস্তৃত নয়, মানবহৃদয়ের কিছু মৌল আবেগ-অনুভূতির বাইরে যায় না তাঁর কবিতা। এই স্বল্পসংখ্যক অনুভূতি, শব্দ, উপমাকেই তিনি অদ্ভুতভাবে বারে-বারে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করে গড়ে তুলেছেন আশ্চর্য কিছু কবিতা, যেন ন্যূনতম কিছু সরঞ্জামই কবিতা তৈরির জন্যে যথেষ্ট। একে কি বলবো নতুন-রকমের minimalist কবিতা?

একই শব্দ তাঁর কবিতায় বারবার ব্যবহৃত হতে দেখে তাকে যদি কবির অপটুতার নিদর্শন মনে করি তাহলে ভুল করব। এ ব্যবহার ইচ্ছাকৃত। তাঁর কবিতা লেখা হয়েছে গানের ধাঁচে, তাই একই শব্দ বারবাব ঘুরে-ফিরে আসে—তৈরি হয় একটা নিজস্ব আবহ, মেজাজ, 'সুবের ও ভাবেব মাদকতা'। চিত্তরঞ্জনেব শব্দব্যবহার অমনোযোগী নয়। তাই 'ডাকিছ আমারে সমস্ত পরান ভরে—পরান মাঝারে!' অথবা 'শুনেছ আমার অন্তরের আর্ত স্বর—অন্তর মাঝারে'-এর মতো পঙক্তিগুলোতে কোন সমার্থক শব্দ ব্যবহার করতে গেলেই তাদের ধার কমে যাবে। 'প্রেম ও প্রদীপ'-এর অন্ত্যমিলগুলোর দিকে একবার দৃষ্টি দিলেই দেখি, 'আমার', 'তোমার', 'মাঝারে', 'আঁধারে' শব্দগুলো বাবংবার ফিরে-ফিরে আসছে, যেন কবি শুধু সম অন্ত্যধ্বনির স্মৃতি নিয়েই সন্তুষ্ট নন, তিনি চাইছেন ধ্বনির সঙ্গে ভাবনারও পুনরাবৃত্তি। একই সঙ্গে আছে কিছু লাইন বা বাক্যাংশের ধুয়োর মতো ফিরে-ফিরে আসা। অথচ এই ধুয়োকে নিয়মিত ছাঁদে পরিণত হতে না দেওয়ার মধ্যে তাঁর সূক্ষ্মবোধের পরিচয় পাই। ষষ্ঠ স্তবকে একই শব্দ 'অন্ধকার' ফিরে-ফিরে আসছে, কিন্তু তার অর্থ কেমন পালটে যাচ্ছে, তা দেখেছি। কখনও সমোচ্চাবিত শব্দ কিন্তু ভিন্ন অর্থে এসেছে, অনেকটা ফরাসি 'rime riche'-এর মতো, যা সূক্ষ্ম শব্দ সচেতনতা ছাড়া সম্ভব নয় :

তোমাদের আছে মৃত্যু ঘোর
অনন্ত জীবন হেথা, কোথা মৃত্যুঘোর? ['জীবনের গান', *মালঞ্চ*]

কাজেই যাকে কবির শব্দভাণ্ডারের দারিদ্র্য বলে মনে হতে পারে তা আসলে তাঁর ভিন্নরকম শিল্প-চেতনার ফসল। অল্প-কিছু ভাবনা-অনুভূতি-শব্দের একটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় সূক্ষ্ম জাল জড়িয়ে আছে চিত্তরঞ্জনের কবিতাকে। ঠিক এমনটি আজ পর্যন্ত অন্য-কোন বাঙালি কবির মধ্যে দেখিনি।

পাঁচ

উপরের কথাগুলো সবই *সাগর সঙ্গীত* সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। *সাগর সঙ্গীত* সে-সময়ের সাড়া-জাগানো কবিতার বই। কিছু বদ্ধমূল ধারণা ঝেড়ে ফেলতে পারলে আবার কি নতুন করে তাতে সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়? সাগরের বিশালতা ও বৈচিত্র্যকে চিত্তরঞ্জন ভগবৎ-অনুভূতির চমৎকার objective co-relative হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যার সংস্পর্শ মানুষের অভ্যস্ত ক্ষুদ্র আয়তন ভেঙে নিয়ে যায়, দাঁড় করায় বিরাটের মুখোমুখি :

তোমারে ভুলিয়াছিনু হে সিন্ধু আমার!—
আপনার স্বপ্নবদ্ধ ক্ষুদ্র খেলাঘরে—

...

যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জনে,
ভাঙিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিভিল!
আমারে তোমার বক্ষে ডুবাইয়া দিল।

তবে আরো সূক্ষ্ম করে বললে বলতে হয়, বইয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিমা সাগর নয়, সাগরের গান। এ-গান অনেক সময়ই অশ্রুত রাগিণী, শুধু মর্ম দিয়ে শোনবার জিনিস। তাই বিরোধাভাসের ভাষাতেই তার প্রকাশ সম্ভব :

কি শব্দে নিঃশব্দে ফোটে চিত্ত-শতদল।

অথবা,

কত শত শব্দহীন সংগীত জাগিছে,
কত শত সংগীতের পূর্ণ নীরবতা!

সাগরের সদা-পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে, সকালে-সন্ধ্যায়, প্রশান্তিতে ও রুদ্র তান্ডবের মধ্যে বিভিন্ন সুরে এই সংগীত শুনেছেন তিনি। অল্প কয়েকটি উপমা-চিত্রকল্পের সাহায্য নিয়েই কবি এই অন্তহীন পাওয়া না পাওয়ার সুখ ও বেদনার অনুভূতি শুনিয়েছেন—,অনেকটা ক্যালাইডোস্কোপের আলোর ছটার মতো বিন্যাস পালটে-পালটে। সাগরের প্রতিমার সঙ্গে জড়িত এপার-ওপারের ধারণা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতেই অপারে পৌঁছেছেন। অন্তরের ঐশ্বর্যের কাছে শব্দ-চিত্রকল্পের স্বল্পতা কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি :

জানি না কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানি না গানের সুর, তাল লয় মান,
আমার অন্তর তলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়াভরা আমার পরান!

অনুভবের গভীরতা পুরনো প্রতিমাতেই নতুন করে প্রাণ স্পর্শ দিয়েছে :

সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হয়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণতলে।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগীবর।
নিবিড় নিশ্বাস হীন ধীর স্থির আঁখিকর,
পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার।

এ শুধু বাংলার ভক্তি-সাধনারই নয়, কবিতারও পুনর্নবীকরণ।

অন্তর্যামী কবিতা হিসেবে কিছু অনুজ্জ্বল। *সাগর সঙ্গীত*'এর কেন্দ্র-প্রতিমা যদি হয় গীত, তবে *অন্তর্যামী*তে কবি পথের উপমা ঘিরেই হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা গেঁথে নিতে চেয়েছেন :

কোথা পথ কোথা পথ কোন্ পথখানি
সে পথ বিহনে যে গো সব মিছা মানি।

এর মধ্যে সাধকের আকুলতা হয়তো আছে, কিন্তু কবিতার নিজস্ব আবেদন-সৃষ্টির পক্ষে তা বড় সরাসরি। কাজেই, 'এ পথ সে পথ নয়', 'সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী', 'ওই বুঝি, সেই পথ ভূমি?/মন-মাঝে ঢেকে ঢেকে রেখেছিলে তুমি!/তুমিই দেখালে পুনঃ!' এবং 'পথের মাঝে এত কাঁটা। আগে নাহি জানি'—ইত্যাদি খন্ডচিত্রের মধ্যে দিয়ে উপমাটির বিস্তারের চেষ্টা করলেও তা সাগরের অনুভব-বেদ্য গানের মতো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেনি। সাগরের চিত্রকল্প ব্যবহারে যে তির্যকতা ছিল তা হারানোর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কবিতাও হারিয়েছে অনেককিছু। তবু তার মধ্যে তাঁর কল্পনা মাঝে-মাঝে ঝলসে উঠেছে, কোন ছায়া-মন্দির বা মনের একতারা অথবা বুকের মধ্যে জয়ধ্বনির মতো কিছু প্রতিমা আশ্রয় করে।

*কিশোর-কিশোরী*তে এসে চিত্তরঞ্জন তাঁর পুরনো স্পর্শ আর একবার ফিরে পেয়েছেন। বইটি একদিক দিয়ে তাঁর কাব্য-সাধনার স্বাভাবিক পরিণতি, কিন্তু আরেক দিক দিয়ে দেখলে একটা নতুন পরীক্ষা। যে অধ্যাত্ম-চেতনার ক্ষীণ আভাস *মালঞ্চ*'এ ভাঙাচোরা প্রকাশ পেয়েছিল, *মালায়* যাকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখি, *সাগরসঙ্গীত*-এ যা কবিকে আলোড়িত ও *অন্তর্যামী*তে ব্যাকুল করেছিল, পাওয়া-না-পাওয়ার আভাসে-ইঙ্গিতে, আনন্দ-বেদনার মধ্যে দিয়ে যা তাঁকে টেনে এনেছে, *কিশোর-কিশোরী*তে তা প্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে পৌঁছেছে। দ্বিধা-ব্যাকুলতা ও ক্ষণিকের তৃপ্তির জায়গায় এসেছে উল্লাসের ছন্দ, তুরীয় মুহূর্তে উত্তরণের উন্মাদনা। কবিতার অনেকটা অংশ জুড়ে আছে একসার প্রশ্নবাচক লাইন। কিন্তু এগুলো অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের জন্যে নয়। *ইংরিজি* অলংকারে যাকে বলে রেটরিক্যাল কোয়েশ্চেন, এরা তাই—প্রশ্ন করার ভঙ্গির মধ্যেই নিহিত আছে প্রবল অভ্যর্থক উত্তর। যে-চিত্রকল্পগুলো আগে ব্যবহার করেছিলেন সেগুলো আবার ফিরে আসছে—কিন্তু পালটে যাচ্ছে তাদের ছাঁদ, অনুষঙ্গ, আবেদন। এমনকি বহুদূরে *মালঞ্চ*'এর যুগ থেকেও উপমা এসেছে, একেবারে নতুন হয়ে :

অখন্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপ রস গন্ধ ভরা আত্মার মন্দির।
পদতলে কলকলে কাল উর্মিমালা
শিরে কোন দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা।

এর সঙ্গে আছে কিছু নতুন চিত্রকল্পও, যা নতুন অভিজ্ঞতার দ্যোতনা দেয় :

জ্বলন্ত প্রদীপ হতে যেমন জ্বালায়,
আর একটি প্রদীপ আনি তাহারই শিখায়,
তেমনই আমারে লয়ে ধরিল যখনই,
তব রূপ-শিখা 'পরে জ্বলিনু তখনই।

(এই চিত্রকল্পের পেছনে বৈষ্ণব ভাবনার সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের জন্মান্তরের উপমাও মিশেছে।) যাঁরা রবীন্দ্রনাথ পড়ে চিত্তরঞ্জনে আসবেন তাঁদের কাছে :

কার পূজা লাগি বল প্রদীপ জ্বলিল?
কোন্ দেবতার কোন্ মন্দিরের গায়;
ঝুলে ঝুলে জ্বলিতেছি দিবস নিশায়?

লাইনগুলোর ঠিকমতো রস-আস্বাদনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে অগ্রজ কবির স্মরণীয়তর, 'অন্তর্যামী', *চিত্রার* লাইনগুলো—'জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার/করিবারে পূজা কোন্ দেবতার/রহস্যঘেরা অসীম আঁধার/মহামন্দিরতলে?' কিন্তু দুটি চিত্রকল্পের আবেদন একেবারেই আলাদা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিমা সূক্ষ্ম কিন্তু অনেকটাই নির্বস্তুক, তাঁর মহামন্দির রূপক। চিত্তরঞ্জনের ছবি অনেক সাবয়ব ও কাছের—যেন আমাদেরই দেখা কোন মন্দিরের চির-চেনা ছবিতেই অলোকের স্পর্শ লেগেছে।

কিশোর-কিশোরীর আসল নতুনত্ব কিন্তু অন্য জায়গায়। এক অর্থে কবিতাটা একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এখানে চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব দর্শনকেই কবিতায় রূপান্তরিত করতে চাইছেন। অচেতন আত্মলীনতার স্তর পেরিয়ে পরমাত্মার স্পর্শে চেতনার উন্মেষ, তারপরে জন্মে-জন্মে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার লীলা—এইসব ধারণাগুলোকেই যেন কবিতার মধ্যে নির্মাণ করার চেষ্টা। শুধু বিবৃতি দিয়ে নয়, কল্পনার মধ্যে দিয়ে সাবয়ব করতে চাইছেন দার্শনিক তত্ত্ব। কখনও, যেমন জন্মজন্মান্তরের ছবি আঁকতে কল্পনা একটু লাগামছাড়া হয়েছে, কিন্তু এই কঠিন ব্রতে মূলত তাঁর সাফল্য নিয়ে সংশয় নেই। কবিতার গঠনে কীর্তন গানের বিভিন্ন পর্যায়ের রেশ ব্যবহার করা হয়েছে অসম্ভব নৈপুণ্যের সঙ্গে। কান পাতলে যেন লাইনের হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে শ্রীখোল ও করতালের দ্রুত লয় পরিবর্তন স্পষ্ট ধরা যায়। মহামিলনের সংজ্ঞা কবিতার ভাষায় যেমন অনুভব করি দর্শনের গদ্য-ব্যাখ্যায় তেমনটা পারতাম কি?

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধূম লেগেছে!
পরাণ-কমল মাঝে কে জানি জেগেছে!
যুগে-যুগে পাওয়া পাওয়া না-পাওয়া মিলন
যেন রে সার্থক হল! পূরিল জীবন।

ছয়

তবু জীবনের শেষ দশ বছর কবিতাকে ছেড়ে ছিলেন চিত্তরঞ্জন। সে কি অর্থ অথবা পরমার্থের জন্যে? মাঝপথে কবিতাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পেছনে এ-দুটো কারণকেই সাধারণত প্রবল হয়ে উঠতে দেখি। (পরমার্থ বলতে অবশ্য শুধু ধর্মীয় সাধনাই নয়, কোন রাজনৈতিক আদর্শের জন্যে সংগ্রামকেও ধরতে হবে।) অর্থের জন্যে যে চিত্তরঞ্জন কবিতাকে ভোলেননি তা তো পরিষ্কার। তাঁর জীবনীপঞ্জির দিকে একবার তাকালেই দেখি, যখন তিনি কোলকাতা উচ্চ-আদালতের খ্যাততম আইনজীবী, তখনও তিনি নিভৃতে কবিতা লিখেছেন। ব্যবহারজীবন ছিল তাঁর কাছে জীবনের বাহ্য দিক, কবিতাই ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ সাধনা। আর পরমার্থ? এক অর্থে, তাঁর কবিতা তো পরমার্থেরই সাধনা। *মালঞ্চ*-এর শুরু থেকে উনিশশো পনেরো পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের কবি-জীবনে একটা স্পষ্ট গতি লক্ষ করি। যে অন্তর-জীবনকে তিনি কবিতার অনন্য বিষয় বলে বেছে নিয়েছিলেন এবং কখনও প্রেম (*মালা*), কখনও প্রকৃতি (*সাগর সঙ্গীত*), আবার কখনও নিজেরই অন্তরের পথে (*অন্তর্যামী*) তাকে খুঁজেছিলেন, *কিশোর-কিশোরীতে* তার একটা সৌম্য পরিণতি ঘটেছে। আরও ব্যক্ত করে বলা যায়, পরমাত্মাকে উপলব্ধির যে সাধনা তিনি করেছিলেন, এই শেষ বইতেই তা ঈঙ্গিত স্বর্গে পৌঁছেছে। এরপরও লিখে চললে তাঁকে করতে হত পুরনো অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি অথবা রোমন্থন। এবং যেহেতু তাঁর কবিতায় অনুভূতি-ভাষা-চিত্রকল্পে রবীন্দ্রনাথের মতো বিপুলতা বা বৈচিত্র্য ছিল না, সেহেতু তাঁর পুনরুক্তি ক্লান্তিকর হওয়ার আশংকা ছিল। ঠিক কোন্ সময়ে থামতে হবে তা বুঝতে অতি সূক্ষ্ম বোধ ও জীবনের প্রিয়তম বিষয় নিয়েও

একটা নিরাসক্তি আয়ত্ত করতে হয়, জগতের কবি-শিল্পীদের মধ্যে তাকে কোনমতেই সুলভ বলা চলে না। চিত্তরঞ্জন এ-ব্যাপারে অবিশ্বাস্য প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তবু সম্ভব ছিল, কবিতার মধ্যে দিয়ে নয়, পরমার্থের আরও প্রত্যক্ষ সাধনার জগতে চলে যাওয়ার, তাঁরই সমসাময়িক শ্রীঅরবিন্দ যেমন গিয়েছিলেন। সেই সাধনমার্গে কবিতা-গানও একটা তির্যক পথ, এক জায়গায় তাও থেমে যায়। দিলীপকুমার রায়ের গল্পের নায়িকা বলেছিল, 'এ গানটি তোমার মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম এর ভাবরূপে, উপমার দীপ্তিতে। কিন্তু গুরুদেবের মুখে এ গানটির মধ্যে শুনতে পেলাম কাব্যের উপমা নয়—বাঁশির ডাক। ... আর যেই দেখতে পেলাম সাধনার আলোর সঙ্গে কবিতার আলোর তফাৎ কোন্‌খানে ও কেন—অমনই মনের মধ্যে সব গেল ওলট-পালট হয়ে, সঙ্গে-সঙ্গে আমার প্রাণ ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মতো উদ্বেল হয়ে উঠল—যেতে হবে যেতে হবে এই উচ্ছ্বাসে'[৪]। সেই বাঁশি, সেই আলো তেমন করে ডাকেনি চিত্তরঞ্জনকে।

তাই বলে কি চিত্তরঞ্জনের জীবনের সাধনা *কিশোর-কিশোরী*তেই শেষ হল? লক্ষ করলে দেখি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পরই তিনি হঠাৎ কবিতা লেখা বন্ধ করেছিলেন। তার কারণ, এখন থেকে দেশ ও মানুষের সেবাই হয়ে উঠল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। *মালঞ্চ*-এর পরই তাঁর মানস ও সংবেদনের যে-দিকটিকে তিনি ধ্রুবের পরিচয়বাহী নয় মনে করে কবিতা থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, এখন সেই দিকটাই প্রবলভাবে ফিরে এল তাঁর জীবনে। 'আমার ঈশ্বর' বা 'অভিশাপ' কবিতায় যে জগতের পরিচয় তিনি জেনেছিলেন, এখন থেকে তাই হয়ে উঠলো তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। উনিশশো-চোদ্দোয় তাঁর পত্রিকার 'নারায়ণ' নামকরণের মধ্যেই সাধনার ক্ষেত্র পরিবর্তনের প্রথম ইঙ্গিত পাই। চিত্তরঞ্জনের নারায়ণ নরনারায়ণ, 'আমার ঈশ্বর'এর বিলম্বিত পরিণতি, 'যত্ন করে গড়ে' তোলা নিজের ঈশ্বর। এখানে এসেই তাঁর বহির্জীবন আর অন্তর্জীবনের মধ্যে কোনো ভেদ রইল না, যাপিত জীবন ও সাধনার জীবন এক হল—তাই কবিতার প্রয়োজনও ফুরলো।

এই সংকলনে কবিতার পাঠের ব্যাপাবে মূলত *কবি-চিত্ত*'এর উপব নির্ভর কবা হয়েছে। তবে সবক্ষেত্রেই কবিব জীবৎকালে প্রকাশিত বইগুলির শেষ-সংস্করণের পাঠেব সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। যতিচিহ্ন ব্যবহারে চিত্তবঞ্জন খুব মনোযোগী ছিলেন না, বানানের ব্যাপারেও তিনি প্রাচীনপন্থী। কিন্তু বানানের আধুনিকীকরণ করা হলেও কবিব ব্যবহৃত যতি-চিহ্নেব কোনো পবিবর্তন কবা হয়নি। তাঁব ভাবায় কিছু আঞ্চলিক টানও ('শুনিছি', 'বুঝিছি') অবিকৃত বাখা হয়েছে। তবে কিছু ছাপার ভুল সংশোধন কবা হয়েছে এবং দু-একটি ক্ষেত্রে স্তবকবন্ধে চরণ সংস্থাপনের ব্যাপাবে নিজেব বিচারেব উপব নির্ভব কবেছি। কবিব কাব্য-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধের অংশ অন্তর্ভুক্ত কবা হল, সেগুলি দুষ্প্রাপ্য বলেই নয়, তাবা কবিব মন ও কাব্যবীতি বুঝে নিতে সাহায্য কবে বলেও বটে।

চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম

উল্লেখপঞ্জি

১ সুকুমার সেন : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ পর্ব।
ভূদেব চৌধুরি : *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, চতুর্থ পর্যায়।

২. কবি চিত্তরঞ্জনের ভবিতব্য যে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রসঙ্গেই সীমায়িত হয়ে যাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমাদের বাংলা সাহিত্য-বোধের উপর রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণার অবরোধ এখনো অবিচল। চিত্তরঞ্জনের কবিতা সম্পর্কে তাঁর শীতলতা আমাদের

অনুভূতিকেও স্পর্শ করেছে। এই জড়তা কাটানো অবশ্যকর্তব্য। অনেক মানুষকে রুষ্ট করার ঝুঁকি নিয়েও বলি, কবি চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সংবেদনের সীমারই পরিচয় দেয়।

৩. বুদ্ধদেব বসু : 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক'।

৪. John Alexander Chapman : 'Chittaranjan Das's Poems' in *Religious Lyrics of Bengal* (1926).

৫. দিলীপকুমার রায় : *অঘটন আজো ঘটে* (১৯৫৬)।

চিত্তরঞ্জন
দাশের
কাব্যসংগ্রহ

মালঞ্চ

১৮৯৬

মালঞ্চ।

—:•:—

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

প্রণীত।

—:•:—

কলিকাতা ; ১৭ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৯।

'মালঞ্চ' দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯১২) আখ্যাপত্র

উপহার

আসিয়াছ শুধাইতে লয়ে মধু হাসি,
নব বরষের করি মঙ্গল কামনাঃ
নয়নে এসেছে লয়ে সুখ রাশি রাশি,
নির্বাপিতে জীবনের জ্বলন্ত যাতনা।
রাখ মোর হস্ত 'পরে ওগো বরাঙ্গনে!
কোমল মঙ্গলভরা প্রিয় হস্তখানি;
তোমার ও শুভদৃষ্টি থাকুক জীবনে,
ভাগ্যহীন জনমের তুমি হও রানী!
প্রথম প্রভাতে আজি নব বরষের,
উঠুক ফুটিয়া তব প্রেম-পুষ্প, হাসি,
সুন্দর মঙ্গলরূপে!—লুব্ধ হৃদয়ের
আশা-দীপ, তাড়াইয়া অন্ধকার রাশি।
তোমারে কি দিব শুভে! কহ আজ, কহ?
মঙ্গল কামনা শত লহ তুমি লহ!

তোমার প্রেম

তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ!
দিবানিশি করিতেছে হৃদি-রক্ত পান।
নিত্য নব সুখ ভরে,
ঝলসিছে রবি-করে;
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্বাণ
তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ!

তোমার ও প্রেম সখি! ভুজঙ্গের মতো,
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত!
প্রতি নিশ্বাসেই তার,
বরিষে মরণ-ধার,

আকুল চুম্বন আর, দংশিছে সতত!
তোমার ও প্রেম সখি! ভুজঙ্গের মতো!

তোমার ও প্রেম সখি! স্বপন সমান—
সুখশ্রান্ত শশীসম মোহ-ম্রিয়মাণ!
নিশীথের অন্ধকারে,
কুসুমের গন্ধ-ভারে,
অজানিত সুখ করে হিয়া কম্পমান!
তোমার ও প্রেম তাই স্বপন সমান!

তোমার ও প্রেম সখি! নিশি আঁধিয়ার!
তমোময় আবরণ আমার তোমার!
কোন্ মোহ-আকর্ষণে,
হাতে হাত লয় টেনে—
তার পরে লুপ্ত করে এ বিশ্ব-সংসার!
তোমার ও প্রেম সখি! নিশি আঁধিয়ার!

তোমার ও প্রেম সখি! অনলের প্রায়!
হৃদয়ের ফুল-বন দগ্ধ করে যায়!
তীব্র দুঃখ, তীব্র সুখ,
শান্তিহীন শ্রান্ত বুক,
চির দীর্ঘশ্বাস মোর অন্তরে জাগায়!
তোমার ও প্রেম সখি! অনলের প্রায়:

তোমার ও প্রেম সখি! মৃদু মধু আলো!
কুসুম-চুম্বনে তার, জীবন জুড়াল।
কোন্ রজনীর তীরে,
কেমনে আসিল ধীরে,
নবস্ফুট প্রাণ-'পরে স্বপন রাজিল!
তোমার ও প্রেম সেই মৃদু মধু আলো!

তোমার ও প্রেম সখি! প্রবাসীর প্রায়,
অনন্ত অচিন্ত্য ভাবে ভাসে কল্পনায়!
অর্ধেক পরান হরে,
আর অর্ধ থাকে ভরে,
তৃষাতুর হৃদয়ের অন্ধ বেদনায়!
তোমার ও প্রেম সেই প্রবাসীর প্রায়!

তোমার ও প্রেম সখি! অদৃষ্ট সমান,
নিষ্ঠুর শকতি-পূর্ণ, অনন্ত, মহান!

হয়ে জীবনের প্রভু,
হাসায় কাঁদায় কভু ;
ও রাজ-চরণে তবু লুটায় পরান!
তোমার ও প্রেম মোর অদৃষ্ট সমান!

তোমার ও প্রেম সখি! ভিখারির প্রায়,
আমার প্রাণের কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়!
যা ছিল সকলি খুলে,
সঁপেছি চরণ মূলে ;
তবু সেই আঁখি তুলে, বাসনা জানায়!
তোমার ও প্রেম সখি! ভিখারির প্রায়!

তোমার ও প্রেম সখি! অমর-জীবন—
শান্তিরূপী নন্দনের চির-আরাধন!
অসার স্বপন লয়ে,
থাকিলে নিদ্রিত হয়ে,
ধুলা ভরা ধরণীর ধূলি নিমগন,
তোমার ও প্রেম আনে জাগ্রত জীবন!

তোমার ও প্রেম সখি! মরণ সমান—
জীর্ণ শান্ত জীবনের শান্তি-আবরণ!
কোমল তুষার কর,
রাখিয়া ললাট 'পর,
জুড়ায় জ্বলন্ত জ্বালা আনিয়া নির্বাণ!
তোমার ও প্রেম তাই মরণ সমান!

তোমার ও প্রেম সখি! তোমারি মতন,
অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্যে মগন!
অধর, প্রশান্ত ধীর,
আঁখি, কৃষ্ণ, সুগভীর,
পুষ্পিত হৃদয়-তীর সৌরভ-স্বপন!

এই কাছে এসে চাও,
ওই দূরে চলে যাও,
এ সকল ক্ষণিকের অর্ধ-আলিঙ্গন।
সমস্ত হৃদয় তব,
অজানিত নিত্য নব,
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন!
তোমার ও প্রেম সেই তোমারি মতন!

রানী

মধুর অধরে তার প্রভাতের প্রভা,
লাবণ্য-ললিত বাহু নিন্দিছে নবনীঃ
নিশ্বাসে চন্দন গন্ধ, ভালে শুভ্র শোভা,
চরণ-পরশে রক্ত অলক্ত অবনী।
অখণ্ড সুন্দর তনু, অনিন্দ্য মুরতি,
গীত-গন্ধ বর্ণ-ভরা সুধার ভাণ্ডার!
তারি মাঝে উদ্ভাসিত অনিমেষ-জ্যোতি,
জ্বলন্ত সুন্দর প্রাণ, অনন্ত, উদার!
হৃদয়ের আশা তার, ভ্রমরের মতো,
সৌন্দর্য-সঙ্গীত-পুঞ্জ তুলিছে গুঞ্জরি!
হৃদয়ের প্রেমে তার প্রস্ফুট সতত,
জীবন-নিকুঞ্জবনে যৌবন-মঞ্জরি!
রানী হয়ে করিয়াছে রাজত্ব স্থাপন,—
আমারি হৃদয়ে তার পদ-পদ্মাসন!

জাগরণ

আমার এ প্রেম তুমি রেখ না বাঁধিয়া,
    হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বন্ধ কুসুমের ;
সমস্ত-গগন-ভরা পবনে লাগিয়া,
    সমস্ত ধরণী পাক্ প্রেম মরমের।

সুনীল নয়ন তব নহে গো আকাশ,
    প্রাণ-পাখি আর নাহি ধায় নিরুদ্দেশঃ
ও তনু-পরশ নহে বসন্ত-বাতাস,
    বাসনার স্বর্গ নহে তব কৃষ্ণ কেশ।

আজি এ হৃদয় মোর ছিঁড়েছে বন্ধন,
    পড়েছে বিশ্বের আলো পুষ্প-কারাগারে
আবর লাবণ্য তব, নিবার চুম্বন,
    ভেসেছে তরণী আজ মুক্ত পারাবারে।

    প্রভাতে জাগ্রত হৃদি, শেষ কর গান ;
    আমার জীবন-ভরা বিশ্বের আহ্বান!

ওফিলিয়া

(OPHELIA)

বর্ণহীন শুভ্র শোভা! ম্লান মরতের
ওফিলিয়া! তুমি যেন প্রভাত শিশির!
অনন্ত-সৌন্দর্য-ভরা কবিহৃদয়ের
ওফিলিয়া! তুমি যেন স্বপন নিশির!
ওফিলিয়া! মৃদু প্রেম তব মরমের—
কুসুম কোরক সম সুন্দর সুধীর—
শত ছিন্ন, পরশিয়া ক্ষিপ্ত-প্রেমিকের
দিবসের দুর্ভাবনা দুঃস্বপ্ন নিশির!
দেবতার বজ্র যেন আসিল নামিয়া
তোমার মস্তক 'পরে, সুন্দর তরুণ:
সুবর্ণ শৈশব-স্বপ্ন সকলি ঢাকিয়া,
চির-অস্তাচলে গেল জীবন-অরুণ!
এস এস পুষ্প হাতে, পূর্ণ পাগলিনি!—
সুধায়ো না—চক্ষে লেখা জীবন-কাহিনী!

ঋণী

তুমি চাও স্বপ্ন-ভরা প্রেম নিরমল,
তুমি চাও মর্মপূজা রক্ত হৃদয়েব. :
তোমার ঐশ্বর্য চাই জীবন-সম্বল ;
তুমি চাও স্বর্ণ-মেঘ, ফুল নন্দনের!
ঋণী আমি সকলের ; জনম ভরিয়া
কত আর কব শুধু আশ্বাসবচন!
বিশ্ব-ভরা ক্ষুধা যেন ফেলেছে ঘিরিয়া—
রিক্তহস্ত, নিরুপায়, অস্থির জীবন!
জনমের আছে দাবী, মরণের দেয়,
তোমরা ভুলিয়া কর মিছে অভিমান:
ভগ্ন হৃদি, দগ্ধ তনু, ধূলা মুষ্টিমেয়,
জীবন-চরণে রবে মরণের দান!
আমার যা আছে তাই লয়ে যাও সব,
তার বেশি বৃথা আশা, মিছে কলরব!

আমার ঈশ্বর

সম্মুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়া,
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ-অন্ধকার।
নিষ্প্রভ নয়ন হতে যেতেছে হারায়ে
জীবনের লক্ষ্যগুলি ; ভাঙিয়া পড়িছে
প্রাণের আবাস! তাই আজ ডাকিতেছি
বারে বারে, কোথা ওহে নিখিলনির্ভর!
আমার এ অর্ধ-অন্ধ জীবনের ভার
লহ তুলে, আশ্বাসিয়া বিপন্ন হৃদয়।
ওহে চিরোজ্জ্বল রবি! কেন অন্ধকার
জীবন ভরিয়া মোর? কেন আশে পাশে
মৃত্যু-ভরা প্রেত-ছায়া, নিষ্ঠুর নর্তনে,
জীবনের প্রতি কক্ষ করে আন্দোলিত?
ওহে দেব! তুমি কর অভয় প্রদান,
আমার হৃদয়-পুষ্প সাদরে চুম্বিয়া
সুরঞ্জিত কর প্রভু! স্বর্ণ-করে তব।
শৈশবে আছিনু শুভ্র শিশিরের মতো,
কখনো দেখিনি দেব! ঘোর কৃষ্ণছায়া
সৌন্দর্যে তোমাব। আপনারি শুভ্রতারে
করিয়া নয়ন, পূর্ণ শুভ্র হেরিতাম,
রোগে শোকে সুখে দুঃখে আকুল সংসার।
প্রভাতকিরণ-দীপ্ত শিশিরের মত
সোনার শৈশব মোর, আকাশের গায়
কনক-বরণে মাখা জলদের মতো,
গিয়াছে ভাসিয়া—আমারে রাখিয়া গেছে,
আশা-ভরা ভয়-ভরা পথিকের প্রায়,
জীবনের অর্ধ-আলো অর্ধ-অন্ধকারে!
ওই যে আসিছে আরো গাঢ় অন্ধকার!
নিখিল সংসারে দেব তুমি অধিপতি!
তোমার নিশ্বাসে বহে বসন্তমলয়—
তোমারি নিশ্বাসে প্রভু! শীতের সমীর
বহিছে ধরণী 'পরে—করিছে কুঞ্চিত
বসন্ত-সঞ্চিত সুখ, জীবন-প্রবাহ,
শুষ্ক করি পুষ্পগুলি ধরণীর বুকে।
এই যে অন্তর মোর মগ্ন অন্ধকারে,
তুমি জান জগদীশ! রহস্য তাহার।

তোমারি আদেশ যদি, বল অন্তর্যামী!
এর পর-পারে, পড়িবে কি আঁখি 'পরে
সুন্দর—সরস—পুষ্প-পরশের মতো,
নন্দনের আলো? সহস্র-সঙ্কল্প-ভরা
তরুণ জীবন, আশা দিয়ে, প্রেম দিয়ে,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, নিত্য রচিতেছে
কত না আগ্রহ ভরে সুবর্ণস্বপন!
বল দেব! বলে দাও, তিমির-তরঙ্গ
করেছে আকুল মোরে গভীর গর্জনে!
বল দেব! পারিব কি লয়ে যেতে শেষে
সাঁতারিয়া, স্বপ্ন-ভরা নবীন হৃদয়
নন্দনের পথে? আমার প্রাণের তরে
নাহি মোর কোন ভিক্ষা ; কিন্তু ওহে দেব!
আমার প্রাণের মাঝে রেখেছি রুধিয়া
প্রাণ হতে প্রিয়তর অপূর্ব স্বপন!
আজ তুমি কর মোরে অভয় প্রদান!
আকুল অন্তরে কত সুধায়েছে দাস—
করনি উত্তর দান! মর্মাহত প্রাণে!
সুপ্তোত্থিত শিশুসম, সেই সে কাহিনী
আবার উঠেছে কাঁদি কাঁপিয়া কাঁপিয়া!
জীবনের সিন্ধু মম, আজি এ আঁধারে
কোন্ মোহ ভরে, কোন্ পাপ-পুণ্যবলে
কি জানি কিসের লাগি করেছে মন্থন!
ওগো উঠে নাই তাহে সুধা এক বিন্দু!
দুরন্ত অনল-ভরা বিদ্রোহ অসীম,
স্কন্ধে লয়ে ধরণীর রহস্যের ভার,
কালকূটরূপে আজ উঠেছে ভাসিয়া
আমার হৃদয় মাঝে। তারি বিষে মোর
জর্জরিত হিয়া! হে প্রভু, দয়ার নিধি,
লুণ্ঠিত চরণে তব দীনের বেদনা,—
দয়া কর আজ!

বুঝেছি, বুঝেছি তবে
কহিবে না কিছু! তৃষার্ত জিজ্ঞাসা মোর
আনিছে ফিরায়ে তব লৌহ-বক্ষ হতে
রুদ্ধ ভাষা অশ্রু-সিক্ত লজ্জা-নত আঁখি!

শক্তিশীল, দৃষ্টিহীন, শ্রবণবিহীন,
নির্মম নিষ্ঠুর তুমি, পাষাণের মতো।
এই যে বেদনা-ভরা কম্পিত ধরণী,
চিরদিন মৃত্যুময় মলিন মেদিনী,
আনিছে চরণে তব, প্রতি প্রভাতের
ভাষাহীন আশা, প্রতি নিশীথের
মর্মভেদী কাতরতা, ডাকিছে তোমায়
কত না ব্যাকুল কণ্ঠে, আকুল পরানে।
কেমনে শুনিবে?—তুমি সুখের সম্রাট!
স্বর্গের রাজন্! তোমার নন্দন মাঝে
সে ক্রন্দন পশিবে কেমনে? বুঝিয়াছি
আজ, তুমি শুধু কনককিরণ-ব্যাপ্ত
চির সুখ চির গর্ব আনন্দউজ্জ্বল!
ছায়াহীন মায়াহীন রুদ্র রৌদ্রসম
করুণাবিহীন তুমি, অনন্ত নিষ্ঠুর।
তবে সেই ভালো; সংশয়শঙ্কিত প্রাণ,
দুরু-দুরু হৃদয়ের কাতর বেদনা,
ছায়া-অন্ধ নিশিথের মর্ম-অশ্রুজল,
রবি-দীপ্ত দিবসের রুদ্ধ মনোব্যথা:
এর চেয়ে, নিশ্চয় নিষ্ঠুর সত্য ভালো
শতগুণে। তবে সেই ভালো; জীবনের
ভেঙেছে আবাস, যদি ভেসেছে বিশ্বাস,-
তুমি থাকিয়ো না আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন!
গেছ যদি, ভালো করে যাও, মুছে দাও
অর্ধ-অন্ধ জীবনের কম্পিত স্বপন।
তুমি যাও, আমি থাকি আপনারে লয়ে
ডুবিয়া হৃদয় তলে, গভীর—গভীব!—
আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব নন্দন!
তার পরে, শেষে, আনন্দ উজ্জ্বল করে,
করুণা মলিন করে সর্ব প্রাণ ভরে,
যত্ন করে গড়ে তুলি আমার ঈশ্বর!
আকুল পরান লয়ে, ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণতলে আসিব না আর।

স্বপ্ন

সেই সে তামসী নিশি নির্দয় নির্জন,
    ভাষাহীন অনন্তের রহস্যের মতো :
ভাঙিল বিভোর নিদ্রা, মেলিনু নয়ন,
    অন্তর-বাহির অন্ধ-অন্ধকার-গত।

সহসা স্বপনসম সুন্দর নির্মল,
    ভাসিল আঁধার-মাঝে মানস-মুরতি :—
অপূর্ব অধরখানি চন্দ্র করোজ্জ্বল,
    আঁখি দুটি সন্ধ্যা দীপ মঙ্গল-আরতি।

কহিল না কোন কথা, নীরব নিশ্চল
    নির্দয় দেবতাসম ছিল দাঁড়াইয়া,
ভয়হীন ভাষাহীন চির-হাস্যোজ্জ্বল ;
    সকল আকাঙ্ক্ষা মোর উঠিল কাঁপিয়া।

চলে গেল: ঘনীভূত কেশপুঞ্জ তার
আকাশে আঁকিয়া গেল ঘন অন্ধকার।

প্রাণের গান

দুরাশা-কম্পিত সুরে কি গান গাহিব আর,
এত গীতি মনে মনে এত ভুল বারবার।

ধ্বনিত বসন্ত তানে অন্তরের চারি ধার,
আমার দুর্বল ভাষা শক্তিহীন ছিন্ন-তার।
কি যেন শুনাতে চাই, কি যেন ফুটাতে চাই,
জন্মভরে যেন সখি! ফুটাতে পারি না তাই।

শত পুষ্প পড়ে ঝরে, শত গীতি যায় মরে ;
হৃদয়ের গান রহে আমারি হৃদয় ভরে।

কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
স্তম্ভিত বিজন গীতি, শুনাতে পারি না তাই।

ধরণীর আলো লেগে, লাজে গীতি ফিরে যায়,
আপনা আবরি রাখে—যত ডাকি 'আয়-আয়।'

অপূর্ব বাসনা আর গীতভরে পূর্ণ প্রাণ,
শত গীত আলোভরা হৃদয়-মন্দির ম্লান।

কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
অভিশপ্ত হৃদি মোর,—গাহিতে পারি না তাই।

ঘুম-ঘোর

আমি তো সঁপিনি হৃদি,
　　আপনি পড়েছে ঢুলে
নিশীথের ঘুম-ঘোরে
　　তোমারি চরণ মূলে!
মরণেরে দেব বলে
　　পরান খুঁজিনু হায়!
ভুবন ভ্রমিয়া দেখি
　　সে প্রাণ তোমারি পায়।

দিবসে

দিন গেল, আন সাকী! প্রমত্ত মদিরা
ভরিয়া সুবর্ণ-পাত্র! করিলে চুম্বন—
ম্লানমুখী এ দিবসের আলোক সুধীরা
আরক্ত চঞ্চল হয়ে ভরিবে জীবন!
আসে পাশে যাবে ভেসে কুসুমসৌরভ,
বসন্তসঙ্গীত যাবে বন উজলিয়া :
অধরে বাড়িবে তব লাবণ্য-গৌরব,
কুন্তল-ভুজঙ্গ রবে হৃদি জড়াইয়া!
দিয়ো না অসহ্য সুখে ফেলিতে নিশ্বাস ;
আরক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিয়া মুখ ;
কাঁপিয়া উঠিলে মোর জীবন আবাস—
বুঝিতে দিয়ো না কোথা সুখ, কোথা দুখ!
মলিন গম্ভীর দিন, লাগে না গো ভালো,—
অনলে দহিতে চাই, স্বর্ণ-সুরা ঢাল।

অহঙ্কার

তুমি উচ্চ হতে উচ্চ, ধার্মিকপ্রবর!
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ,—
ওগো ! কোন্ শূন্য হতে আনিয়া ঈশ্বর,
জীবন তাহারি কর আরতির গান?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়ো না ফিরিয়া,
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্ :
ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক!
রক্তহীন রিক্তহস্ত কঙ্কাল জীবন,
সব রক্ত করে পান ঈশ্বর তোমার!
রুদ্ধ করি নিরুপায় জীবন-মরণ
চরণে দলিয়া করে মহা অত্যাচার!
কোন্ মুখে কার তরে কর অহঙ্কার?
মুছে ফেল আঁখি হতে মোহ-অন্ধকার!

আকাঙ্ক্ষা

যদিও তোমারি কথা আমার জীবনে,
    বসন্ত রাগিণীসম উঠেছে বাজিয়া—
যদিও তোমারি প্রেম-রবির চুম্বনে
    হৃদয়ের রক্তফুল উঠেছে ফুটিয়া!—

এ প্রাণের প্রতি ভাব-প্রমত্ত-ভ্রমর
    যদিও তোমারে ঘিরি আনন্দে গুঞ্জরে—
বসন্ত-পরশসম স্বপনে তোমার,
    যদিও প্রাণের মৃত মুকুল মুঞ্জরে!—

আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর,
    তোমার স্বপন ছাড়ি তোমারে চাহিছে ;
মধু দেহে সুখ স্পর্শ রহস্য গভীর,
    অপূর্ব অধরে তব চুম্বন মাগিছে :

কোথা তুমি ? কাছে এসো, করহ সৃজন
ধরণীর ম্লান বক্ষে নন্দন-কানন !

প্রেম-চতুষ্টয়

১

আজি এ তামসী নিশি ধরণী আঁধার!
কম্পিত কামনাভরে প্রমত্ত হৃদয় :
মদিরার মোহসম, ও তনু তোমার
অলস আবেশ আনে সারা দেহময়!
চঞ্চল অনিল চুমি অঞ্চল দুলিছে,
তোমার কুন্তলভরা কুসুমের গন্ধ :
বসন্ত-পাগল প্রাণ সকলই চাহিছে,
কত কি মাধুরী তব লাজ-বাস-বন্ধ!
আঁধারে কাঁদিছে তাই চঞ্চল লালসা,—
আজ তুমি খোল তব চির আবরণ :
অন্তর অমৃত পিয়ে মেটেনি পিপাসা,
এ তনুর চিরতৃষ্ণা কর নিবারণ।
শোন না আঁধারে হৃদি করিছে ক্রন্দন?
অন্ধ নিশি বসন্তের মানে না বন্ধন।

২

শুন না কম্পিত বাণী পুষ্পিত ছলনা
কুসুমের গন্ধভরা অন্ধ হৃদয়ের!
এ নহে সুবর্ণ সুখ নন্দন-মগনা,—
এ যে শুধু অন্ধ তৃষ্ণা পূর্ণ আঁধারের!
জান না কি দেবতার আশীর্বাদ-ছায়ে
ফুটেছে অপূর্ব এই প্রেম দুজনার?
পরিম্লান ধরণীর ধূসর ধুলায়
এ প্রেম মরিয়া হবে মৃত্যুর আঁধার।
এ মোর স্বর্গের আশা সুন্দর দুর্বল!
বাসনা-নিঃশ্বাস তুমি ফেলিয়ো না তায় :
ভয় হয়,— পাছে মোর জীবন-সম্বল
দেবতার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে যায়!
যা কিছু সুন্দর, এই প্রেম তাই থাক্,
আঁধিরা রজনী তবে পোহাইয়া যাক।

৩

বসন্ত-সুন্দরতনু তরুণ দেবতা!
এসেছ জীবনতটে, লও উপহার—

প্রণয়কম্পিত দেহ মধু পুষ্প-লতা,
সঘন গম্ভীর নিশি মোহান্ধ-আঁধার!
ওগো আমি আঁখিহীন, নিশীথ মন্তরে?
দেখিতে পাই না তব সুখভরা মুখ;
তোমার পরশভরে ফুটিছে অন্তরে
রক্তসুখ রাশি-রাশি, রাশি-রাশি দুখ!
আমার হৃদয় দেহ গীত-ভরা বীণা
তোমার চুম্বন তাহে চম্পক-অঙ্গুলি :
আছি মোহ-অন্ধকারে তোমাতেই লীনা,—
চকিতে চমকি উঠে সঙ্গীত বিজুলি।
মধুর মৃদুল ভাষে কও কথা কও,
চেয়ো না কাতরকণ্ঠে, লও সব লও!

৪

তুমি তো এসেছ কাছে অনলের মতো,
সঙ্গে লয়ে জ্যোতির্ময় অনন্ত ক্ষমতা!
জ্বলিছে তরুণ দেহ হৃদয় সতত,
তোমার ও প্রেমে প্রভু! নাহি কি মমতা?
আমার এ পিঞ্জরের নাহি করি ভয়,
লোকলজ্জা কলঙ্কের আছে কিবা ডর?
ভুল করে বুঝিয়ো না রমণী-হৃদয়,
মর্মহীন অপমানে বাঁধিয়ো না ঘর!
এ প্রেম আমার চক্ষে অনন্ত সুন্দর
চির পুষ্প-তনু হীন অনঙ্গের প্রায়:
ও রূপ আমার বক্ষে মদন-মন্তর
মোহ ভরে কম্পমান সবি ভেসে যায়!
তবে যে তরাসে কাঁপি এত কাছে কাছে?
এ রুদ্র রক্তের জ্বালা রহে যায় পাছে।

ঈশ্বর

ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ-শান্তি নিতেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন!

জীবন-যাতনা তরে সজল নয়ন,
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়াঃ
আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া,
সত্য বলে পূজা করি অলীক স্বপন!
হায়! হায়! মিথ্যা কথা ; ঈশ্বর! ঈশ্বর!
করুণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনেঃ
ঠেলে ফেলি জীবনের বিনীত নির্ভর,
ধরণীর আর্তনাদ শুনি না শ্রবণে!
ঊর্ধ মুখে চেয়ে থাকি, ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি মনে-মনে।

স্মৃতি

সে আছিল আমাদের শান্তির স্বপন,
অতি দূর নন্দনের সৌন্দর্য-কাহিনী ;
রবিকর-মুখরিত প্রভাত-মগন,
শশিকর-বিভাসিত প্রফুল্ল যামিনী।

আরো কত ছিল তার সৌন্দর্য অপার,
বলিতে অন্তর কাঁপে সুখ-দুঃখ-ভারেঃ
অমৃত-পরশে তার ভুলি শতবার
বুঝিতে পারিনি কভু চিনি নাই তারে।

আজ সে চলিয়া গেছে ; ভাসিতেছে তার,
শান্তিভরা সুখভরা সুন্দর নয়ন।—
নবস্ফুট বসন্তের মাধুরী অপার,
শশিসিক্ত শরতের শুভ্র সে স্বপন।

আজ সে গিয়াছে চলে ; স্বপ্ন ছায়ে তার
বিশ্ব-অঙ্গে ফুটিতেছে নব-নব শোভাঃ
ফুলে ফুলে ফুটিয়াছে মধু স্মৃতি তার
চাঁদে চাঁদে ভাসিতেছে তারি মধুপ্রভা।

সুখ

সুরাপূর্ণ স্বর্গ-পাত্রে করেছি চুম্বন,
বুঝিয়াছি সুখ বিনা সকলি তো ফাঁকি।
আজ আমি খুলে দিব জীবন-বন্ধন:
আজ তবে তুমি দাও যাহা আছে বাকি।
অমর চুম্বন দাও অধর ভরিয়া,
নয়ন মুদিয়া আমি মধু করি পান:—
তোমার কুন্তল পাশে আমারে বাঁধিয়া,
হৃদয় ভরিয়া কর গুণ-গুণ গান।
মধু-হস্তে ধরি পাত্র মুখে ধর মোর,
সুবর্ণ মদিরা মোরা আরো করি পান:
নয়নে আসুক নেমে রজনীর ঘোর,
তোমার কম্পিত লজ্জা হোক অবসান!
অপেক্ষায় সুখ-পুষ্প যেতেছে ঝরিয়া,
দেবতারা হাসে শোন গগন ভরিয়া।

ভুল

ভুলায়ে রেখেছে মোরে
তোর নয়নের তারা!
ওই আঁখি পানে চেয়ে
পরান পাগলপারা!
বিশ্ব যায় ভেসে ওরে!
কত বল্ রাখি ধরে:
কেমনে বা রাখি ধরে
আমি যে আপনাহারা!
আকাশে যখন চাই
শশীতারা কিছু নাই—
শুধু জাগে ওই, ওই,
তোর নয়নের তারা।

তৃষা

তোমার সৌন্দর্য আর মোর ভালবাসা,—
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে দুই তুলনা-বিহীন:
পিপাসিত প্রাণে তুমি আকাঙ্ক্ষিত আশা,
করুণ-ক্রন্দনে হৃদি পূর্ণ চিরদিন!
আমার সকল অঙ্গ তৃষা জর জর,
তোমার পরশে পাবে বারি বৃষ্টিদান:
আমার সকল মনে শুষ্ক মর-মর,
তোমার ও প্রেম হবে বসন্তের গান।
ওগো! তুমি দেখা দাও বারেক আসিয়া,
ক্ষুধিত তৃষিত চিত্ত চির-অপেক্ষায়:
যদি তুমি নাই এস, সুদূরে হাসিয়া
বরিষ স্বপনধারা সুদীর্ঘ-সন্ধ্যায়!
আমার এ প্রেম বুঝি তৃপ্তিহীন তৃষা,
সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা।

সান্ধ্য সাগরে

আজ কেন মনে আসে
দুটি আঁখিভরা বাসে
মধুর মুরতি হৃদে উঠেছে জাগিয়া?

কে তুমি ডাকিছ মোরে,
সমস্ত হৃদয় ভরে?
শুনিতে পেয়েছি তব আকুল আহ্বান।
কে তুমি এসেছ কাছে,
হৃদয়েব পাছে-পাছে
কে তুমি শুনাও চির-পরিচিত গান?

আজি কেন, আজি কেন
আকুল পরান হেন?—
শত ধারা ভাঙি যেন যাইবে ছুটিয়া!
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে,
ধূসরিত সাগরান্তে,
তোমার চরণ-প্রান্তে পড়িবে লুটিয়া।

চিরদিন

রেখে গেছ জন্ম শোধ বিদায়ের বেলা
প্রেম ভরা অশ্রু ভরা বিষাদ-চুম্বনঃ
সুখ-দুঃখ-বিজড়িত হৃদয়ের মেলা
রেখে গেছে চিরস্মৃতি সজল নয়ন।
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে ধূসর গগন,
তোমার মলিন মুখ মেঘে আসে নেমে ;
পরিপূর্ণ শুভ রাত্রি জোছনা-মগন,
তোমারি মলিন ছায়ে হাসি যায় থেমে।
আর তুমি যেথা যাও আমি আছি সাথে।
কাছে কাছে, পাছে পাছে, মৃত্যুর মতনঃ
সমস্ত জীবন তব সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভরেছি নিশ্বাসে মোর করিয়া যতন।
দুটি দুঃখ ফুটিয়াছে জীবনের ফুল—
মিলনের মধু-স্মৃতি স্বপনের ভুল।

পূর্ণিমা

সতত সরস হাসি পূর্ণিমা আমার!
জীবন ডুবিয়া গেছে হাসিতে তোমার!
আমি নিশি, তুমি চাঁদ,
ভেঙেছ জীবন বাঁধ
ভাসায়ে হৃদয় মোর প্রেয়সী আমার!
সতত সরস হাসি অধরে তোমার!

সতত সরস হাসি বসন্ত আমার!—
পুষ্পিত জীবন মোর হাসিতে তোমার।
আমি গীতি তুমি ছাঁদ—
পেতেছ মোহন ফাঁদ,—
বেঁধেছ কুসুম-ডোরে জীবন আমার!
সতত সরস হাসি নয়নে তোমার।

ও মধু সরস হাসি শরদ্ প্রভাত!
তুলেছি কুসুমরাশি ভরিয়া দু-হাত!
মধুর সরস গানে
মাধুরী ভাসিছে প্রাণে,

মরম মদিরা পিয়ে ভরি ফুল পাত!
তোমার সরস হাসি শরদ্ প্রভাত!

হায় প্রিয়ে! হাস-হাস ভরিয়া গগন।
জীবন-মরণ তব হাসিতে মগন।
হাস আর হাস হাস,
জোছনা-সাগরে ভাস,
অধর হাসুক তব হাসুক নয়ন!
মদির জোছনা হৃদি করিছে চয়ন।

সে

সে!— এসেছিল, কেঁদেছিল,
বসেছিল কাছে
ভয় ভয় কথা কয়
ব্যথা পাই পাছে।
আঁখি তুলে চেয়েছিল
ভেসে আঁখি-জলে:
মুখ খুলে থেমে গেল
আধ খানি বলে।
এক বিন্দু হাসি তার
ঠোটে লেগেছিল,
ভালো করে দেখি নাই
কোথা মিলাইল!
দুটি হাত ধরে মোর
কি যে ভেবেছিল,
'বিদায়' বলিয়া শুধু
কেঁদে থেমে গেল।
সেই যে গিয়াছে চলে
আর আসে নাই—
সেই চেয়েছিল চোখে
আর চাহে নাই।
পথ পানে চেয়ে আছি
আসিবে কি শেষে?
উজলিবে হৃদি মোর
মৃদু মধু হেসে?

জোছনা

এস প্রিয়ে স্বপ্নময়ী!
প্রেমময়ী সুধাময়ী!
কাছে এসে একবার দাঁড়াও হাসিয়া!–
সায়াহ্ন-সঙ্গীত তালে,
পুষ্পিত প্রদোষকালে,
স্বপ্ন-ভরা রূপ তব, রাখ বিস্তারিয়া।
স্বপ্নময় চন্দ্রমার
রজত-কিরণধার,
সর্বাঙ্গে পড়ুক তব প্রেয়সি আমার।
শান্তি-ভরা ঘুম ঘোর
নয়নে আসিবে মোর
জীবনেব যত জ্বালা ভুলিব আবার।

ক্রন্দন

এ দেহ পুষ্পের মতো
ওহে প্রাণপ্রিয়!—
সর্বদা বসন্ত চাহে,
চাহে রবিকর!
তোমার পরশ-স্বপ্ন,
চুম্বন-অমিয়,
এ তনু লাবণ্য পারে
করিতে অমর!
প্রভাত-চুম্বিত ছিনু—
প্রফুল্ল পুষ্পিত,
বিশুষ্ক মলিন আজি—
গত গন্ধ প্রায়!
তোমার চুম্বন শূন্য
অরুণ—অতীত,
ও সুখ-পরশ ভিন্ন
বসন্ত কোথায়?

আমার লাগিয়া আমি
করি না রোদন,
তোমার প্রেমের লাগি
যত ব্যথা পাই:
লাবণ্য হারায় যদি
বিপন্ন বদন,
ও প্রেম নন্দন তব
পাই কি না পাই!
প্রিয়! এ ক্রন্দন তাই।

সোঽহং

অসার সকল জ্ঞান ; ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী!—
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী
আপনার মনে আনে মোহ-অন্ধকার।
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহা দেবতার:
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে?
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার।
জান নাকি মন্ত্রময় মুকুরের মতো
নিতান্ত নিষ্ফল হেথা মানবের প্রাণ?
যত কর অন্বেষণ, হের অবিরত
শত আবরণে আপনারে মূর্তিমান।
কাহার চরণে তবে সাজাইছ ডালা?
কারে ভাবি কার গলে পরাইছ মালা?

সাগরে

চন্দ্রমা-চুম্বিত শোভা সুনীল আকাশে,
তালে তালে নাচিতেছে সাগরের জল:
আর্দ্র বায়ু বহে যায় আর মনে আসে
সেই আঁখি, সেই হাসি, সেই অশ্রুজল।

জীবন বিজন বড় ; বিশ্বব্যাপী ব্যথা—
বুঝবার জুড়াবার নাহি কোন ঠাঁই।
অভিশপ্ত প্রাণ লয়ে জন্মিয়াছি হেথা,
অনন্ত বাসনা শুধু চাই! চাই! চাই!

তাপসী

শুনেছি আহ্বান তব ওহে প্রাণপ্রিয়!
আমার অন্তর আজি উঠেছে কাঁপিয়া:
ছিন্ন করি আশা-পুষ্প জীবন অমিয়,
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া।

বিভূতি মেখেছি হের সর্বাঙ্গে আমার
সুবর্ণ স্বপন সবি বিবর্ণ বিরাগ:
চরণে এনেছি মোর জীবন-আধার
রাগে রাঙা জবাসম রক্ত অনুরাগ।

কবিতা কল্পনা ছিল, পূর্ণ শশীসম
জীবন আঁধারে মোর জোছনা ঢালিয়া:
মধু নিশি শেষ হল! স্বপ্ন মনোরম
জীবন ত্যজিয়া আজি গিয়াছে ভাসিয়া।

এ চির বিদায় নিতে বেদনা বেজেছে,
তরুণ হৃদয় মোর গিয়াছে ছিঁড়িয়া:
শুনেছি আহ্বান তব স্বপন ভেঙেছে,
রচেছি পূজার ডালি হৃদি-রক্ত দিয়া।

ডেক না ডেক না আর শুনেছি আহ্বান,
আমার হৃদয়-তল উঠেছে কাঁপিয়া:
সঁপেছি চরণে যত পুষ্প হাসি গান
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া।

সাগর-তীরে

ফেলিয়া এসেছি দূরে জীবন-জনতা,
শত লক্ষ মানবের, অন্ধ কোলাহলঃ
হেথা শুধু আকাশের সুনীল বারতা,
গম্ভীর সাগর-গীতি, স্তব্ধ ধরাতল।

সৌম্য শান্ত সান্ধ্যছায়া পড়েছে সাগরে,
গগনে ভাসেনি শশী স্বপনে সাজিয়াঃ
আঁধারের মাঝে আজি কোন্ মোহভরে
স্বপ্নময়ী স্মৃতিগুলি উঠিল ভাসিয়া।

সেই, এমনি সায়াহ্ন আকাশের তলে,
তারকার পানে চেয়ে ছিলে দাঁড়াইয়াঃ—
সহসা অধরে তব যেন কোন্ ছলে
বিমল বিহ্বল হাসি উঠিল ভাসিয়া।

কি জানি কেমন করে সে হাসি তোমার
আঁধার হৃদয় মোর গেছিল প্লাবিয়াঃ
শত লক্ষ কুসুমের পরশে আমার
বিভোর অলস প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া।

আর সেই? সেই নিশি, স্বপন-মগন?
শশীকর পড়েছিল অধরে তোমারঃ—
দুটি হাতে হাত আর নয়নে নয়ন,
তার পরে ছাড়াছাড়ি হল দুজনার।

আজ তুমি এত দূরে? ভাবিতেছি কত
অপার অনন্ত সিন্ধু মাঝে দুজনারঃ
ও পারে দাঁড়ায়ে তুমি দুরাশার মতো,—
এ পারে তোমারি তরে জীবন আঁধার।

বিফল ভিক্ষা

এত টুকু চেয়েছিনু, এত টুকু মধু,
এত ধন আছে তব ওহে প্রাণবঁধু!

কিছু দিতে নাই?
মলিন নয়ন দুটি স্বপনের সিন্ধু,
চেয়েছিনু তাহারি কৃপাদৃষ্টিবিন্দু,
পেয়েছি কি তাই?
তোমার পরশ স্বর্ণ—সুধা-পারাবার
একটি তরঙ্গ সখি! যদি দিতে তার,
ফুরাত কি ছাই?
সঞ্চিত অশ্রু লতলে কত শত নিধি,
একটি দিলে না তার? তোমারে কি বিধি
দয়া দেন নাই?
পাশ দিয়ে চলে গেলে, সুবাস ঢালিলে
চকিত পরানখানি চরণে দলিলে,
ভালো ভালো তাই!

লালসা

সুন্দর হৃদয় পূর্ণ শুভ্র দেহ তব,
নয়নে ভাসিছে যেন নন্দনপিপাসা!
তোমার পবিত্র হৃদি,
প্রশান্ত অর্ণবঃ
আমার এ প্রেম যেন
তরঙ্গিত আশা!

ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যেন ক্ষিপ্ত-সিন্ধু প্রায়
এ তপ্ত রক্তের জ্বালা যেতেছে বহিয়াঃ
তুমি যে সুন্দর, তুমি
তরঙ্গের ঘায়,
ক্ষীণ তৃণদল-সম
যাইবে ভাসিয়া।

আমার এ যৌবনের প্রমত্ত গরল,
বিশ্ব অঙ্গে জ্বালিয়াছে প্রলয় অনল!
আর আসিয়ো না কাছে,
কি জানি গো পাছে
দগ্ধ হয়ে যাও তুমি
শুভ্র শতদল।

গুঞ্জরে লালসা মোর, লুব্ধ অলি যেন!–
তোমার বদনে চক্ষে সুন্দর তরুণা!
বদ্ধ গীতি সান্ধ্য ছায়ে!
কি জানি গো কেন?—
এ মরু মরমে মোর
কাঁদিছে করুণা।

তুমি তো জান না আজ, সরল নয়নে
অনন্ত বিশ্বাসে তব, কি দিতেছ আনি!
তোমার ও দেহ-মন—
কুসুম-চয়নে,
কত সুখ কত ভয়
আমি তাহা জানি।

সুন্দর মরমভরা শুভ্র তনু লখি,
নয়নে লাবণ্য ভাসে প্রশান্ত বিবশা!
এখনো সময় আছে
ফিরে যাও সখি!
আমার এ প্রেম শুধু
রক্তের লালসা।

মোনা

সে দিন ভাসিয়া গেছে
কি জানি কেমন?

বসন্ত মলয়ে মন্দ
আন্দোলিত ফুলগন্ধ
হৃদয় ললিত ছন্দ
ব্যাপ্ত দশ দিশি।
সে দিন চরণে তব
করিল চুম্বন
মোর প্রাণ হতে বালা!—

প্রস্ফুটিত পুষ্পমালা
রক্ত সুখ রক্ত জ্বালা
সর্ব দিবানিশি।

আর কেন? গেছে প্রেম
মিছে আনাগোনা।
অধরে ভাসিলে হাসি
জেনো প্রতারণা!
'নয়নে অনল শুধু
সত্যের ছলনা'
আজ মোনা!

বিগত বসন্ত ভরে
এ প্রেম অতিথি
আনি পূর্ণ ভালোবাসা
জাগাইয়া স্বর্ণ আশা
জীবনে বাঁধিয়া বাসা
করিল বসতি!
স্বপ্ন রথে লয়ে গেল
হইয়া সারথি!
বসন্ত কি আছে আর
কোথা অমৃতের ধার
কোথা প্রাণে পুষ্পভার
কোথা স্বপ্নভাতি?

আমি পূর্ণ ঘুমে, তুমি
নিতান্ত জাগিয়াঃ
সেই বসন্তের নিশি
ম্লান চন্দ্র দিয়া
আধ অশ্রু আধ হাসি
আধ জানা-শোনা
নাই মোনা!
অনন্ত সুন্দরী ছিলে
বসন্ত-নিশায় ;
বাসনাবিহীন হাসি
শুভ্র শেফালিকা রাশি
তোমার অধরে ভাসি
শীত চন্দ্র প্রায়।

চরণে আনিয়া প্রাণ
সকলি করিনু দান
গরল করিনু পান
প্রেম পিপাসায়
চিরস্মরণীয় সেই
বসন্ত-নিশায়।
লভিনু অবজ্ঞাদৃষ্টি
সুখহীন সব সৃষ্টি
জীবনে অনল বৃষ্টি
মৃগতৃষ্ণিকায়।
তুমি আজ আকাঙ্ক্ষিণী
নব প্রেমানুরাগিণী
অশ্রুভরা ভিখারিনী
মলিন-আননা—
আজ তব হাসি ভাসে,
আমি হেরি অনায়াসে
প্রাণে পুবে শুধু আসে
অতীত কল্পনা।

আজ তুমি ঘুমে, আমি
নয়ন মেলিয়া
'প্রেম তো বিদ্রূপ শুধু'
গেছ কি ভুলিয়া?
বসন্তের শেষে কেন
নব প্রতারণা?
ছি ছি মোনা।
তোমার আমাব মাঝে
রয়েছে পড়িয়া—
নিষ্ফল স্বপন, আব
শত শুষ্ক ফুল-ভার
কত রক্ত লালসার
শ্বেত ভস্মরাশি।

কেমনে ফুটিবে আজি
দলিত কুসুমরাজি:
কেমনে উঠিবে বাজি
সেই সুখ বাঁশি?

তোমার আমার মাঝে
যেতেছে বহিয়া
বিস্তৃত বিস্মৃতি বারি ;
এ পারে দাঁড়ায়ে তারি
আমি পরশিতে নারি
গত স্বপ্নরাশি!
সতৃষ্ণ নয়নে চাও
চুম্ব উড়াইয়া—
যদি আজ এসে পড়ে
তৃষাতুর মোহভরে
আমার জীবন 'পরে
তব চুম্ব হাসি।

অধরে কি তপ্ত লাগে
ফোটে প্রেম রক্ত রাগে
আবার জীবনে জাগে
প্রেম পুষ্পরাশি?
আজ বৃথা অভিসাব
মিছে প্রতাবণা,
নাহি প্রাণে হাহাকার
অবোধ বাসনা!
মায়া মোহ সবি গেছে ;
এ নব ছলনা
মিছে মোনা!

চাও যদি কব তবে
চুম্বন প্রদান:
গাও প্রত্যাশিত তানে
কও কথা কানে কানে
আমার শীতেব প্রাণে
সকলি সমান।
জীবনে অনল নাই
আছে বাসনার ছাই
প্রাণ শুধু করে তাই
পরিহাস পান।
দিবাদগ্ধ রাত্রিহীন
জীবনে আবার

প্রেমমায়া উপবন
নহে সৃজিবার।
কি ভুল আনিবে তবে
কি নব ছলনা?
আজ মোনা!*

কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি

এ নহে রবির লেখা সুন্দবী সনেট,
শরদ প্রভাত সিক্ত শুভ্র শেফালিকা:—
কিম্বা কবি! বাতায়নে মুগ্ধ জুলিয়েট!
এ মোর হৃদয়জাত মলিন মালিকা—
পড়িয়া চরণে তব তুলে দেখ কবি!
তোমার কবিতা আমি বড় ভালোবাসি,
সুখভরা শান্তিভরা স্বপ্নভবা সবি,
ব্যঙ্গভরা বাক্য আর রঙ্গভরা হাসি!
আরো ভালোবাসি আমি প্রিয়ারে তোমার
কত না কবিতা তার অধরে লাগিয়া,
অন্য পানে রাঙা মুখ হইতে যাহার
তোমার অধর কবি লইতে রাঙিয়া।
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট
আমার আগ্রহভরা ভিখারি সনেট।

ধার্মিক

শুধাও ধর্মের কথা দিবস রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায়-কথায়:
বক্তৃতা শুনিয়ে শুধু স্তম্ভিত ধরণী
আহা! আহা! বলি তব চরণে লুটায়
ধরণীর সুখ-দুঃখ অবহেলা করি,
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চি য়া
নিমেষে নিশ্বাস ফেলি ভগবান স্মরি
মানবের শত পাপ দাও দেখাইয়া।

ওহে সাধু! আমি জানি, অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায় ;
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায়।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভান!

অভিসার

কেমনে আসিনু? নিদ্রাহীন নিশি ধরে
বিজনে শুনিতেছিনু বিশ্বের বারতাঃ
আসিল অপূর্ব প্রেম মোহ মন্ত্র ভরে,
পরশিয়া পক্ষে তার কহে গেল কথা।
ভালো করে বুঝি নাই! প্রতি অঙ্গে মোর
পরিপূর্ণ রক্তে হল আনন্দসঞ্চার,
অধর চুম্বন লাগি হইল বিভোর ;
বাহু, বাড়াইয়া চম্পক অঙ্গুলি তার,
খুলিল দুয়ার! আমার তৃষিত চক্ষে
জাগিয়া তোমারি মূর্তি অনিন্দ্যসুন্দর,
প্রাণ সংজ্ঞাহীন, চরণ ধরণী বক্ষে,
মস্তকে সঙ্গীতপূর্ণ অনন্ত অম্বর।
তার পর? সবি স্বপ্ন অনল বরণঃ
আমারে এনেছ বুঝি লোলুপ চরণ?

সাক্ষী

তোমারেই করিয়াছি সাক্ষী জীবনের,
সমস্ত জনম তব চরণে পড়িয়াঃ
কলঙ্ক-কণ্টক-ভরা দুঃখ-শয়নের
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি দেখ পরীক্ষিয়া!—
দেহের পরশ থাকে দেহের সীমায়,
অধরের চুম্ব যায় অধরে মরিয়াঃ

আমার এ প্রাণ শুধু তোমাপানে ধায়,
তোমারি সুবর্ণ প্রেম সর্বাঙ্গে মাখিয়া!
প্রতি নিমেষের তুমি আনন্দ নির্মল,
প্রতি নিমেষের তুমি গভীর বিষাদঃ
পরাধীন তনু বলে হে প্রাণ-সম্বল!
চরণে করেছি কি গো চির অপরাধ?
রুদ্ধ হিয়া বদ্ধ দেহ তৃষিত নয়ন
কত-সুখে কত-দুঃখে তোমাতে মগন।

বিদায়

তোমারি পরশ লাগি অন্তর অধীর,
তোমারি দরশ তরে তৃষার্ত নয়নঃ
প্রতি প্রাতে পরিপূর্ণ আনন্দ মদির,
স্বপ্নালসে করি যেন কুসুম চয়ন।
সন্ধ্যাকালে শূন্যমনে স্বপ্ন ভেঙে যায়,
বাস্তবের অন্ধকারে জীবন মলিন!
স্বহস্তে সজ্জিত পুষ্প শুষ্ক হয়ে যায়,
সুন্দর হৃদয় রাজ্য পত্র-পুষ্প-হীন।
বুঝেছি আমার প্রেমে নাহি লাগে মন,
কষ্ট করে আসিয়ে না দিতেছি বিদায়ঃ
পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে করিয়ো ভ্রমণ
নিত্য নব মাধুরীর পল্লবিত ছায়!
তুমি পেয়ো শত-পুষ্প-বসন্তের বায়,
রেখে যেয়ো সব-শূন্য চির হায়-হায়!

প্রেমপরিহাস

সে দিন ধরণী ছিল নন্দন কানন,
বসন্ত পবন অঙ্গে, পুষ্পোজ্জ্বল হিয়া!
তোমার সুন্দর মন, আনন্দ আনন,
স্বপ্নোজ্জ্বল মধু আঁখি—পূর্ণ উজলিয়া!
মন মধুকর মোর, নয়ন পল্লবে
নিশি-নিশি কত মধু করিয়াছে পান!

আজিকার রুদ্রালোকে জীবন-বিপ্লবে,
সে সত্য কাহিনী লাগে স্বপন সমান।
আমার কি দোষ বল? দেবতা নির্দয়
করিল মোদের লয়ে প্রেমপরিহাস!
দু-দিনের ভুল ভাঙি, জাগিল হৃদয়
শত ছিদ্র সর্বাঙ্গের সুখস্বপ্ন-বাস!
সে রত্ন হারায়ে গেছে কি করিব বল?
তোমার নয়নে অশ্রু নিতন্ত নিষ্ফল!

রক্তগোলাপের প্রতি

কোন্ দেবতার ছিলি আকুল ক্রন্দন,
হৃদয়ের রক্ত পিয়ে রক্তিম বাসনা?
কোন্ মহাপ্রণয়ের নিষ্ঠুর বন্ধন,
অলক্ত চুম্বন আর অমৃত-মগনা!
কোন্ পাদপদ্মে ছিলি অলক্তের দাগ—
নন্দনের শুভ চিহ্ন সুরক্ত স্মরণ!
কোন্ কিন্নরীর ওষ্ঠে তাম্বুলের রাগ—
কোন্ অপ্সরার বুকে রক্তিম বরণ?
সহসা আসিলি যেন নন্দন ছাড়িয়া—
সুরাসিক্ত স্বপনের অস্ফুট আভাস!
জগৎ কমলবনে উঠিল বাজিয়া
প্রভাত রাগিণীসম বিহ্বল বিভাস!
কবিতা সঙ্গীত সবি অসার তুলনা!
এ মনে মদিরা তুই রক্তিমভূষণা।

বারবিলাসিনী

শুন আমি বারবিলাসিনী!
   নিশীথে পিপাসাহরা,
   প্রাণহীন প্রেমভরা:
পদতলে উন্মাদ ধরণী,—
লালসা চঞ্চল হিয়া, উন্মাদ ধরণী!
   আমি শুধু বারবিলাসিনী।

রঞ্জিয়াছি অধর আমার!
   কোমল বিচিত্র রাগে
   আমার অধরে জাগে
রক্ত-আভা ; কেশে পুষ্পসার—
চঞ্চল কুন্তলে মিশে—মধু পুষ্পসার!
   রমণীয় অধর আমার!

মধু অঙ্গ 'পরে নীলবাস,
   নীল গগনের মতো,
   নীল স্বপ্ন বিজড়িত,
উড়াইয়া পুড়াইছে আশ—
চঞ্চল অঞ্চল উড়ি পুরাইছে আশ,
   আবরিছে তনু নীলবাস।

শুভ্র রক্ত চরণ দু-খানি!
   কনক কিঙ্কিণী হাতে,
   কনক কিরীট মাথে,
রজনীর রাজ্যে আমি রানী—
ওগো অন্ধ রজনীর রাজ্যে আমি রানী!
   পুষ্পসম চরণ দু-খানি!

এস পান্থ! ভ্রমিয়া ধরণী!
   চরণে লেগেছে পঙ্ক,
   প্রাণে কাঁপিছে কলঙ্ক:
এস পান্থ! আঁধিরা রজনী—
অবগাহ প্রেমে মোর আজি এ রজনী!
   এলে পান্থ ভ্রমিয়া ধরণী!

অধর-চুম্বন কর পান!
   তরঙ্গিত তনু ভরে,
   সব মধু লও হরে,
আছে যত পুষ্প হাসি গান!
তৃষাহীন নিশা মোর কর অবসান,
   অধর চুম্বন করি পান!

অঙ্গের পরশ লও টানি,
   করিয়া বসন তব
   পাও সুখ নব-নব:
লাজহীন প্রেম-ভরা বাণী,

আঁধারে শুনিয়ো মোর প্রেম-ভরা বাণী।—
   অঙ্গের পরশ নিয়ো টানি।

যাহা আছে, সব লও তুলে।
   রেখে যেয়ো রক্ত জ্বালা,
   তুলে নিয়ো পুষ্পমালা ;
রজনী প্রভাতে যেয়ো ভুলে—
অন্ধ নিশি শেষ হলে সব যেয়ো ভুলে
   আমার সকলি লও তুলে।

কিবা ভয়? রজনী আঁধার।
   কলঙ্ক কম্পিত দেহে,
   অধীর প্রমত্ত গেহে,
কাটিবে গো রজনী তোমার।—
দুরন্ত আনন্দে যাবে রজনী তোমারঃ
   কোথা ভয়? সকলি আঁধার।

তুমি যেয়ো এলে উষারানী
   পুণ্য দেহে শুভ্র হাসে
   পশিয়ো পবিত্র বাসেঃ
রজনীর কলঙ্কের বাণী—
ভুলে যেও রজনীর কলঙ্ককাহিনী
   শুধু আমি রব কলঙ্কিনী।

এ ধরার কলঙ্ক তুলিয়া
   পরেছি পুষ্পিত শিরে।
   এস পান্থ ধীরে ধীরে,
মর্মহীন আবেগ লইয়া—
তোমার কম্পিত তনু—আবেগ লইয়া!
   আমি রব কলঙ্ক বহিয়া।

চারিদিকে শত পুষ্পরাশি,
   করি গন্ধ বিতরণ,—
   মোহিতেছে বিশ্বজন।
আমিও যে, সবারে বিলাসি—
সুমন্দ সুগন্ধ আনি সবারে বিলাসি
   অঙ্গে-অঙ্গে অনঙ্গ বিকাশি!

নাহি প্রাণ, মধু দেহে মোর।
   নাহি সুখ নাহি লজ্জা,

জীবন বিলাস সজ্জা
কাজল নয়নে, ঘুম ঘোর—
চাও পান্থ আঁখি পানে, লও ঘুম ঘোর!
মোহ-ভরা, মধু দেহ মোর।

নাহি স্মৃতি, জীবন ব্যাপিয়া,
নাহি কোন অনুতাপ:
প্রাণময় পরিতাপ
যদি আসে, ফিরাই হাসিয়া—
দিবস রজনী আমি, হাসিয়া হাসিয়া।
কোথা স্মৃতি জীবন ব্যাপিয়া!

আছে রূপ, বিশ্ব-বিমোহন!
পূর্ণ রক্ত শতদল
প্রস্ফুটিত ঢল ঢল,
গন্ধ তার কর আহরণ!
মত্ত মধুকরসম, করি আহরণ,
লও রূপ বিশ্ব-বিমোহন!

আমি যেন চিরদিন ঋণী!
অপার ঐশ্বর্য লয়ে,
বিলাই ভিখারী হয়ে,
বাসনাবিহীন উদাসিনী!—
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী!
কে করেছে মোরে চিরঋণী!

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী!
এ বিশ্ব লালসা ছাই,
সর্বাঙ্গে মাখিয়া তাই,
চলিয়াছি কলঙ্ক-বাহিনী!
মর্মহীন কর্মহীন, কলঙ্ক-বাহিনী!
চিরদিন যৌবনে যোগিনী!

কার অভিশাপে নাহি জানি!
কোন্ মহাপ্রাণে ব্যথা
দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী!
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী!
তারি শাপে চির-কলঙ্কিনী।

মুক্তি

তব প্রেম অত্যাচার হতে হে সুন্দরি!
লভিয়াছি মুক্তি আজ! চুম্বনে কাঁপিত
প্রতি দিবা কৌতূহলে ; আনন্দে জাগিত
চির নিদ্রাহীন শত সচন্দ্র শর্বরী,
হে সুন্দরী!

শ্রান্ত করি দেহ মন ধেয়ান ধারণা
প্রভাতে দিবসে রাত্রে সমস্ত জীবন
কি তিক্ত অমৃতে তুমি করেছ মগন
নিশীথের স্বপ্ন ভাতি দিবসে ভাবনা
নির্ভাবনা?

দুরন্ত জীবন আজ শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া
উন্মাদ আনন্দ সুরা করিয়াছে পান:
তোমার রাজত্ব করি পূর্ণ অবসান
আপন আবেগে আজ যাবে কি জ্বলিয়া
দেহ হিয়া?

অপসৃত প্রাণ হতে চিরবন্দনীয়
নির্দয় পরশ তব রক্ত চরণের:
বিদ্যুৎ দরশ তব নক্ত নয়নের
ঢালে না জীবনে আর সে তীব্র অমিয়
চির-প্রিয়!

সুন্দর চরণাঘাতে কম্প্র হৃদি 'পরে
ফুটে না কুসুমদল মদগন্ধভরা:
পাগল কুন্তল আর আঁধারে না ধরা!
যে স্বর্ণ সৌন্দর্যে ছিল প্রাণ পূর্ণ করে,
গেছে ঝরে!

করপুটে ভিক্ষা মাগি হে বরসুন্দরি!
জনমের মতো তুমি যাও তবে চলে:
জীবন ঢালিয়া মোর বিস্মৃতির কোলে
আপনারি কাছে রব দিবসশর্বরী,
হে সুন্দরি!

অভিশাপ

কত যুগ যুগান্তর দিবস রজনী ধরে
বিশ্বের প্রার্থনা
চির দীর্ঘশ্বাস-ভরা অশ্রু-জল-পরিপূর্ণ
অবোধ বাসনা
ছুটেছে নন্দন পানে, নন্দনের স্বর্ণদ্বারে
হইয়া প্রহত
ফিরেছে ধরণী-বক্ষে ব্যর্থ ব্যাকুলতা-ভরা
মস্তক আনত।
শুনেছে কি বিশ্বরাজ বসি স্বর্ণসিংহাসনে
চিরানন্দ মাঝে?
অতি দূর ধরণীর কোন্ চোখে অশ্রুজল
কার ব্যথা বাজে?
শান্তিহীন ধরাবাসী চরণে এনেছে তবু
মর্ম-উপহার,
জানে নাই সব স্বর্গ রুধিয়া আছিল এক
নির্মম দুয়ার!
একদা প্রশান্ত সন্ধ্যা করুণার প্রাণরূপী
আঁধার বরণ—
দেবতার হাস্য মাঝে আসিল, সচন্দ্র রাত্রে
মেঘের মতন,
মুক্ত করি কেশজাল বিদেশের ধূলি-লিপ্ত
ধূসর চরণ
রাখিলা নন্দন 'পরে শ্রান্ত ছায়াঞ্চল টানি
আনম্র নয়ন!
শিহরিল সুরলোকে অনন্ত আনন্দ-ভরা
সুরেন্দ্রের মন,
শীতের নিশ্বাস লাগি সহসা শিহরে যথা
পুষ্প-উপবন।
স্বর্গের রাজন্ কহে ডাকি সর্ব সুরলোক
হে নন্দনবাসি!
শ্রান্ত এ হৃদয়ে মোর কেমনে বাজিল আজ
সান্ধ্য রূপরাশি?
নিষ্ফল স্বর্গের শোভা অনন্ত বসন্ত ভালো
নাহি লাগে আর—
নব-নব জগতের পরশ লভিব আজি—
আকাঙ্ক্ষা আমার।

দেবেন্দ্রের আজ্ঞামতো প্রহরী খুলিয়া দিল
স্বর্গের দুয়ার,
বসন্তের বায়ু'পরে পারিজাত বরষিল
পরিমলভার।
নিশীথের সাথে-সাথে কনক-প্রদীপ শত
জ্বলিলে নন্দনে,
সকল নন্দন আসি একত্র মিলিল যেন
প্রমোদ বন্ধনে।
বসি স্বর্ণসিংহাসনে সুধা-হস্তে স্বর্ণপতি
সৌন্দর্যবেষ্টিত—
কিন্নরীর নৃত্যতালে, অপ্সরার গীতজালে
নিতান্ত জড়িত।
হেন কালে হু-হু করে আসিল ঝটিকা, আর্ত
ক্রন্দনের মতো
বহিয়া জগৎ হতে প্রাণপূর্ণ হতাশ্বাস
দুঃখ শত-শত।
থেমে গেল নৃত্যগীত। সুরেন্দ্রের স্বপ্নজাল
স্বরুণা-সঞ্চিত,
নিমেষে টুটিয়া গিয়া আপনার মোহ হতে
করিল বঞ্চিত।
নিভিল প্রদীপমালা ; চিরোজ্জ্বল সুরসভা
স্তম্ভিত মলিন,
যেন কোন মহাশূন্য অন্ধকার-পরিপূর্ণ
নিত্য সুখহীন।
অনন্ত গগন-ভরা বৃহৎ বিহঙ্গ যেন
পক্ষ প্রকম্পিয়া
শান্ত করিবারে চায় মর্মভরা ব্যাকুলতা
শান্তিহীন হিয়া।
তেমতি কাঁপিল স্বর্গ। দেবতার দীর্ঘশ্বাস
ভগ্ন হৃদি-ভরা
শ্মশানে ঝটিকা-সম বহিল ভীষণ ভাবে
সুখ-শান্তি-হরা,
তারি মাঝে ধরণীর অনন্ত ক্রন্দনস্রোত
আসিল ছুটিয়া,
নন্দনের কূলে-কূলে নত শির দেবতার
চরণ ঘিরিয়া।

পরদিন স্বর্গপুরে সুপ্রসন্ন সূর্যকর
সুবর্ণ ঝলকে
চুম্বিল সকল স্বর্গ, চুম্বিল সুরেন্দ্র হৃদি
চঞ্চল পুলকে।
বিষণ্ণ নন্দনপতি হস্তস্থিত সুধাপাত্র
ফেলি দিয়া দূরে,
বাজাইলা স্বর্ণ ভেরী আহ্বানিয়া সুরসভা
সুপ্ত সুরপুরে।
বিষাদ কম্পিত কণ্ঠে কহিলা স্বর্গের রাজা—
হে নন্দনবাসি!
আজি হতে মোর রাজ্যে বন্ধ রবে গীত গান
শত উচ্চ হাসি।
আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই এতদিন
ক্রন্দন ধরার,
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্মাহত ধরণীর
চির মর্মভার।
হায় স্বর্গ! হায় ধরা! বন্দী আমি আপনার
নিয়মকারায়,
অনন্তে রচিত মোর হস্তস্থিত সৃষ্টিসূত্র
কোথায় হারায়?—
সৃজিয়াছি শান্ত সুখ, কোথা হতে আসে দুঃখ
মলিন-বরণ?
জীবনের সাথে-সাথে কোথা হতে এল ভেসে
অবাধ্য মরণ?
কাঁদ-কাঁদ ধরাবাসী! তব তীব্র আর্তনাদ
বজ্রশেল-সম,
সহস্র সম্ভোগ-ভরা কম্পিত এ স্বর্গধামে
বাজে মর্মে মম।
সৃষ্টির নিগড় গড়ি চরণে পরিয়া আমি
পূর্ণ পরাধীনঃ
অনন্ত ক্ষমতা নাই, অপার অনন্ত দুঃখ
সব চিরদিন!

স্বর্গ সহচরগণ! আজি হতে আমি হব
ধরণীর প্রাণ,
বাজিবে আমারি মর্মে জগতের দীর্ঘশ্বাস
শত দুঃখ তান!

চির অশ্রুজল চোখে   জাগিয়া রহিব লয়ে
          পূর্ণ পরিতাপ,
বক্ষেতে বিঁধিয়া রবে   শাণিত কৃপাণ-সম
          এই অভিশাপ!

উষা

কখন জাগিলে তুমি হে সুন্দর উষা!
রজনীর পার্শ্বে ছিলে স্বপন-মগন,
কখন করিলে তুমি স্বর্ণ বেশ ভূষা?
ললিত রাগিণী দিয়ে রঞ্জিলে গগন!
তোমারে আবরি ছিল যে ঘোর রজনী
তিমির কুন্তল তার বাঁধিলে যতনে:
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী
সরল নির্মল সুখ কমল নয়নে!
কোমল চরণে আসি শিয়রে আমার
বুলাইলে আঁখি'পরে কুসুমিত কেশ:
চকিতে চাহিয়া দেখি অধর তোমার
আরক্ত আনন্দভরা,—রজনীর শেষ!
পরশিয়া দেহে তব আলোক অঞ্চল
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক-চঞ্চল!

কল্পনা

তোমারে পাবনা জানি! তবু মনে আসে
অনন্ত বাসনা পূর্ণ অসংখ্য কল্পনা:
অন্তরের কানে কানে মোহ মন্ত্র ভাষে
দিবসে নিশীথে জাগি সহস্র জল্পনা।

যদি কোন দিন আমি মুহূর্তের তরে
সব ভুলে যাই তব সৌন্দর্যের ছায়,—
যদি কোন দিন সত্য সত্য মোহভরে
আপনা রাখিতে পারি তব পুষ্প-পায়!—

কল্পনার স্বপ্ন-স্থল সত্য হয়ে উঠে
আপনার বাসনার নিবিড় তৃষায়ঃ
আমার অন্তরতলে শত পুষ্প ফোটে
শরৎ প্রভাতে আর বসন্ত নিশায়।
এ তনুর প্রতি অণু তৃষিত লোলুপ,
এ প্রাণের পিপাসায় কোথা তব রূপ?

নিশীথে

নূপুর খুলিয়া লও!
যদি এই রজনীর অন্ধকারে বাজে—
আমাদের দুজনের কলঙ্কের কথাঃ
যদি এই অর্ধসুপ্ত সংসারের মাঝে
বাতাসে প্রকাশে অন্ধ অন্তরের ব্যথা,—
মর্ম-কাতরতা!

কৌতূহল পরবশ বিশ্বের নয়নে
এ প্রেম সুন্দর যদি ধরা পড়ে যায়ঃ
যদি নব প্রস্ফুটিত এ প্রেম পবনে
দু-জনার সর্বসুখ অন্তরের ছায়
শুষ্ক হয়ে যায়?

দুঃখ

তোমারে চিনেছি দুঃখ! তুমি রাখ মোরে
আবরিয়া কি অপূর্ব প্রেয়সীর মতো
সংসারের সর্ব সুখ হতে! সাধ করে
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লও প্রাণ-পুষ্প শত!
অধরচুম্বনছলে রক্ত কর পান—,
নিশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার,
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধ মৃত্যুর সমান,
বিমুক্ত কুন্তলে কর অনন্ত আঁধার।
* সমস্ত জীবন ওগো রহস্যমধুরা!
দিবসে নিশীথে কর খেলনা তোমারঃ

সর্বদা করেছি পান ওগো তৃষাতুরা।-
আশাভয় প্রেম সুখ সর্বস্ব আমার।
অন্তরে জ্বলিছে চির চুম্বন তোমার,
অনন্ত সুন্দরী তুমি প্রেয়সী আমার।

সুখ

তুমি চিরদিন ভ্রম কনক-কাননে
প্রাণপূর্ণ আশা-পুষ্প চোখে হাস্যভাতিঃ
কি স্বর্ণ মোহন-মন্ত্র তব শুভ্রাননে
বিকশিত পুণ্যালোকে প্রতি দিন রাতি।
দেবতার সুধাভাণ্ডে হে শুভ্র বালক!
ঢালিছ অনিন্দ্য হাসি সে সুধা জিনিয়াঃ
কুসুম দুর্বল দেহ অশান্ত অলক
নন্দনের স্বর্ণকরে নিত্য ঝলসিয়া।
অপ্সরার বক্ষ ভরে তুমি খেলা কর,
কৌতুকে চুমিয়া লও কিন্নরীর মুখঃ
নির্মমের মতো হেথা ছদ্মবেশ ধর—
নিতান্ত মানবাতীত, হে সুন্দর সুখ!
ধরণীর মায়ামৃগ সুবর্ণ-মণ্ডিত,
থাক তুমি স্বর্গপুরে সুরেন্দ্র বন্দিত।

জীবনের গান

সুপ্রসন্ন সুপ্রভাত আজি!
সুন্দর সূর্যের আলো
চরাচর চক্ষে,
সুমন্দ বসন্ত বায়ু
অবনীর বক্ষে
প্রস্ফুটিছে শত পুষ্প-রাজি
পুলকচঞ্চল দল শত পুষ্পরাজি
সুবসন্তে আজি!

চারিদিকে সুবর্ণ স্বপন!
এমন বিহঙ্গ মোর
কোথা উড়ে যায়,
ধরণী ছাড়িয়া কোন্
গগনের গায়?
মোহমগ্ন জীবন মরণ—
কি স্বপ্ন চুম্বিয়া আজি সুবর্ণ বরণ
জীবন মরণ।

আসে প্রেম অনন্ত সুন্দর!
তুলে দেয় হস্তে মোর
রক্ত ফুল তার,
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
মধু গন্ধ ভার:
স্বপ্ন দেয় ভরিয়া অন্তর—
গোপনে চুম্বিয়া যায় আমার অন্তর
এ প্রেম সুন্দর!

আসে নেমে যশ সুরাঙ্গনা!
গগনে ফুটিছে পুষ্প
চরণ আভাসে,
আমারে বাঁধিছে যেন
শত পুষ্প পাশে
স্মিত-হাস্যে প্রফুল্ল-আননা—
সহস্র সৌন্দর্য-ভরা চিরশুভ্রাননা
যশ সুরাঙ্গনা।

পরিপূর্ণ সুবর্ণ নেশায়
আসিছে হাসিছে আশা
শত স্বপ্ন রানী!—
ঢালিছে আমারি কর্ণে
আর স্বর্ণ বাণী:
হস্তে তার মদপাত্র ভায়,—
সে মদ চুম্বিয়া হৃদি কি যে গীত গায়
সুবর্ণ নেশায়!

প্রাণপূর্ণ অপূর্ব স্বপনে!
অস্ফুট সঙ্গীত তালে

ফেলিছে চরণঃ
আনন্দে ফুটিছে পুষ্প
আরক্ত-বরণ
ধরণীর বসন্ত কাননে!—
দেবতার হাস্যভাতি ভাসিছে গগনে
অপূর্ব স্বপনে।

আমি রাজা, সকলি আমার!
আনন্দিত তৃণ 'পরে
দাঁড়াইয়া আমি,
চরণে প্রশান্ত ধারা
আমি তার স্বামী ;
দূর হতে গগন অপার
শ্রবণে ঢালিছে সুরসঙ্গীতের ধার,
ইঙ্গিতে আমার!

ওগো এস এস কাছে মোর।
অনন্ত সৌন্দর্য আছে
বিলাইতে চাই,
অনন্ত জীবন আজি—
তারি গান গাই ;
তোমাদের আছে মৃত্যু ঘোর,
অনন্ত জীবন হেথা, কোথা মৃত্যু ঘোর?
এস কাছে মোর!

দরিদ্র

অনেক সৌন্দর্য আছে হৃদয় ভরিয়া,
সহস্র মাণিক্য জ্বলে অন্তর-আঁধারেঃ
অনন্ত সঙ্গীতরাশি কাঁপিয়া-কাঁপিয়া
দিবস রজনী করে উন্মাদ আমারে!

গাহে পাখি, বহে বায়ু বসন্তের মতো,
নানা বর্ণে শত পুষ্প ফুটে মন-বনেঃ
জগতের কাছে তবু দরিদ্র সতত
মরমে মরিয়া থাকি আপনার মনে!

তোমরা ডেকেছ তাই আনিয়াছি আজ
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন-মালঞ্চের:
তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরেব সাজ,
সৌন্দর্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের

হৃদয় সম্পদরাশি ফুটে না ভাষায়,
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য হারায়!

শেষ

ওগো আর নাই, এই শেষ!
মালঞ্চের পুষ্পবাজি
সকলি দেখেছ আজি
আর কিছু নাই অবশেষ—
রজনী আসিছে নেমে এলাইয়া কেশ—
এই শেষ।

মালা
১৯০২

নিবেদন

এই সব গুলি কবিতাই [illegible] [illegible] অনেক পূর্ব্বে লেখা। [illegible]

শ্রী[illegible] বসু

'মালা' প্রথম সংস্করণের (১৯০২) প্রাক-কথনের প্রতিলিপি

প্রেম ও প্রদীপ

(১)

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে কে বধূজনে
কেন রাখিয়াছ তলে ! প্রদীপ জ্বালিয়া !
তোমার ও প্রদীপের কনক কিরণে
আমার হৃদয় মম উঠে উজলিয়া !
কেন রাখিয়াছ আড়ে ! দুখ-বাতায়নে
সোহাগে যতনে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া ?

আপনারে কেন তবু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া ?
তোমার আনন-খানি পড়ে না দেখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে কোমল-আঁকিয়া !
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা মনে দেখিতে দেখিতে
কেন রাখিয়াছ তলে ! প্রদীপ জ্বালিয়া ?

'মালা' প্রথম সংস্করণের (১৯০২) প্রথম কবিতার প্রতিলিপি

প্রেম ও প্রদীপ

(১)

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?
তোমার ও প্রদীপের কনক কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া!
কেন রাখিয়াছ আহা! সুখ-বাতায়নে
সোহাগে স্বহস্তে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া?

আপনারে কেহ কভু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া?
তোমার লাবণ্য মূর্তি পড়ে না আঁখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া!
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা জাগে দেখিতে-দেখিতে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?

(২)

অন্ধকার ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—
কেন গো এমন করে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরান ভরে—পরান মাঝারে!
আমি অশ্রুজল লয়ে—শুধু চেয়ে থাকি
আমি তো জ্বালিনি দীপ, কি করিয়া ডাকি?

(৩)

তবু মনে হয় শুনেছ আমার
অন্তরের আর্ত স্বর—অন্তর মাঝারে!
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর আঁধারে!
জ্বাল গো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার!

(৪)

তোমার চঞ্চল দীপ আলোক বন্ধন ;
ব্যথিছে সকল মন সর্বাঙ্গ আমার!
কত না অশান্ত সুখ অজানা ক্রন্দন
ঝাপটিছে গরজিছে অন্তরে আমার!
হে মোর নিষ্ঠুরা! কি যে বেদনা বন্ধনে
টানিতেছ সর্ব হৃদি তব সন্নিধানে!
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে!
প্রজ্বলিত হৃদি মাঝে, শূন্য সব ঠাঁই।
হে প্রেম নিষ্ঠুরা! আমি তোমারে যে চাই।

(৫)

আমি যে তোমারে চাই, সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ও প্রদীপের আলো-অন্ধকারে ;
সকল সুখের মাঝে, সর্ব বেদনায়!
কর্মক্লান্ত দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়
ওই তব প্রদীপের আলো অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে!
হে মোর লুকানো ধন! হে রহস্যময়ি!
আজি জীবনের শেষ—আজো তুমি জয়ী!
তোমারে খুঁজেছি আমি আলোক আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি ; মরণ মাঝারে—
সকল সুখের মাঝে সর্ব সাধনায়!
আজি শ্রান্ত জীবনের ধূসর-সন্ধ্যায়
হে মোর লুকানো ধন! আজো তুমি জয়ী!
আজো খুঁজিতেছি তোরে হে রহস্যময়ি!

(৬)

একই সন্ধ্যা আমাদের 'পরে
ঢালিয়াছে ঘন ছায়া তার!
আমাদের দুজনের তরে
পাতিয়াছে মহা অন্ধকার!
আর কিছু নাই—কেহ নাই
আছি আমি—আছে অন্ধকার
আছ তুমি, আর কেহ নাই
আছে শুধু সাঁঝের আঁধার!

হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার?

(৭)

কি জানি কেমন করে জ্বালায়ে রেখেছ ওই—
অপূর্ব প্রদীপ খানি?
আমি মুগ্ধ বাক্যহীন, আমি শুধু চেয়ে রই!
কি দিয়ে কেমন করে জ্বালায়ে রেখেছ ওই
অপূর্ব প্রদীপ খানি?
কি দিয়ে জ্বালিলে বল, হে চির কৌতুকময়ী—
রহস্য প্রদীপ খানি?
কোন্ তপস্যার বলে ওই যে দীপের বুকে
কি সলিতা দিলে টানি ;
কোন্ পূর্ব পুণ্যফলে ফুটায়ে তুলেছ তাহে
আপন প্রাণের বাণী!
সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন ছায়া
সকল ধরণী 'পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া!
এরি মাঝে সত্য-রূপে উজলি উঠেছে ওই!
তোমার প্রদীপ খানি!
কি সত্য সুন্দর রূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই
অপূর্ব প্রদীপ খানি!

(৮)

আমি মুগ্ধ চেয়ে আছি! ওগো মোর বাক্যহীনা!
ওগো মোর নেত্রাতীত চির-অন্ধকার-লীনা!
একি তব চিরজনমের অগীত সঙ্গীত?
একি তব দীপ্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত ইঙ্গিত?
একি তব নির্জ্জনের নীরব প্রস্ফুট বাণী
তুলিছে সফল করি আপন সাধন খানি?
একি তব মরমের সঞ্চিত স্বপনরাজি
পরান ছাপায়ে কিগো উছলি উঠেছে আজি?
একি গো অনন্ত পূজা! একি গো জীবন্ত আশা!
গুপ্ত প্রাণ কুঞ্জে কিগো আলোকিত ভালবাসা?
একি তব সুখ? ওগো একি তব দুঃখে গড়া
এ পুণ্য প্রদীপ খানি?
একি তব অন্তরের সকল সৌরভ ভরা—
আলোক গৌরব বাণী?

(৯)

এই যে এসেছে সন্ধ্যা—প্রদীপ জ্বলিছে
আমি শুধু চেয়ে আছি, মুগ্ধ—একমনে!
অনন্ত গগন ভরা আঁধার নামিছে
নয়ন চাহিয়া আছে, স্তব্ধ একমনে!
ওগো আমি চেয়ে আছি, তৃষার্ত নয়নে
তোমার প্রদীপ-জ্বালা দীপ্ত বাতায়নে!
কেমনে জ্বালিলে দীপ হে অপরিচিতা!
এমন মধুর—মরম—সুন্দর করে—
হে মোর সাধন স্বপ্ন! হে মর্ম-নিহিতা
একি অর্ধ পরিচয অনুবাগ ভরে?
কি অপূর্ব অভিসার! কি সঙ্গীত বাজে
তোমার পরান-দীপ্ত প্রদীপের মাঝে?
আমি শুধু চেযে আছি মুগ্ধ, একমনে!
কি অনন্ত অভিসাব—নীববে নির্জনে।

(১০)

কবে জ্বেলেছিলে দীপ হে রহস্যময়ি!
কবে কোথাকাব, ওগো কোন্ মহা বিজনে?
সৃষ্টিব প্রথম সে কি? ওগো মর্ম্মমযি!
সৃষ্টির প্রথম সাঁঝে কোন্ কম-কাননে?

সেকি এমনি গভীব নীবব গর্জন
অনন্তের? সেকি আলো? সেকি অন্ধকাব?
সেকি এমনি সাঁঝের তিমির নির্জন
মায়া-মন্ত্রালোক ভরা এমনি সন্ধ্যার?—

উজলি উঠিল যবে সেই সে প্রথম,
অনাদি কালেব বক্ষে প্রদীপ তোমাব—
সকল সোহাগ তব সকল সরম
সকল স্বপন তব—আকুল আশার!

তখন কি উড়েছিল বসন্ত বাতাসে
এমনি পাগল-করা সন্ধ্যাঞ্চল খানি?
তখন কি বেজেছিল হৃদয়-আকাশে
এমনি উদাস করা বিধাতার বাণী?—

উজ্জ্বল উঠিল যবে সেই যে প্রথম
আলো অন্ধকার ভরা প্রদীপে তোমার
সকল ধেয়ান তব সকল ধরম
সকল আলোক ওগো! সকল আঁধার!

মরমের সুখ

আমি দুঃখ জানি তাই হে প্রিয় আমাব।
বুঝিযাছি মর্মে-মর্মে সুখের গৌরব!—
রুধিযা বেখেছি মর্মে! হে প্রিয আমাব।—
আন হাস্য, আন গীতি, পুষ্পেব সৌবভ
সাজাও অন্তব মোব। এই যে কাঁপিছে
দুই বিন্দু অশ্রুজল নয়নেব কোণে,
এ শুধু সুখেব ছল! আমাবে ছলিছে,
তোমাবেও ছলিতেছে। মম মন-বনে
আগ্রহে ফুটিতে চাহে শত পুষ্পদল।
দেখাতে পারি না তাহা। হে আমাব প্রিয়।
তাই আঁখিপ্রান্তে মোব ভাসে অশ্রুজল।—
তুমি মর্মে মর্ম আনি সব বুঝি নিয়ো।
আমি দুঃখ জানি তাই হে আমাব প্রিয়।
আমারি মবম তলে সুখেবে খুঁজিও।

সে কি শুধু ভালোবাসা?

কেমন সে ভালোবাসা? বলা কি সে যায়?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমাবি তোমারি গীতি! স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে, তারি পানে ধায়
আকুল আশায়।
তুমি যবে দূরে থাক, ওগো প্রিযতম।
তোমারি আশঙ্ক আশে, নর্তকীর-সম
শৃঙ্খল দোলায় তার নূপুর গুঞ্জনে
পরিপূর্ণ তালে নাচে, এ অন্তব মম
ওগো প্রিয়তম!

কি যে তার চারুবাসে, তরঙ্গ হিল্লোল
কি যে তার প্রাণে-প্রাণে সঙ্গীতের রোল!
তরঙ্গিত দেহপূর্ণ আশান্বিত হিয়া,—
সোহাগেতে সুখে-দুঃখে কাতর কল্লোল,
কি যে সে কল্লোল!

তোমা যবে কাছে পাই, হে আমার প্রাণ—
কোথা ছন্দ, কোথা তাল, উন্মাদের গান!
অন্তর তরণী-সম বিক্ষুব্ধ সাগরে
চোখে-মুখে-বক্ষে তার ঝাপটে তুফান
পাগল তুফান!

এই ভাসে এই ডুবে, জীবন-মরণ
আলো অন্ধকার শূন্য ছায়ার মতন।
সর্বমন, সর্বদেহ, সমস্বরে গায় ;
এস মৃত্যু, এস প্রাণ, এস আলিঙ্গন
চির আলিঙ্গন!

প্রেম-প্রতীক্ষায়

তখনো হয়নি সন্ধ্যা! বিমল আকাশ,
কোমল যেন গো মোর প্রিয়ার বরণ,—
ঢালিতেছে মৃদু মধু, স্বর্ণের আভাস
চুম্বি সরোবর-জল, আম্রের কানন!
তখনো আসেনি প্রিয়া! প্রাণ পেয়েছিল,
সেই অলো-মাঝে শুধু প্রিয়ার আভাস।
আম্র-শাখা দুলাইয়া বহেছিল বায়,—
বসেছিনু প্রিয়া লাগি প্রেম-প্রতীক্ষায়!
তারপর এল সন্ধ্যা ধূসর বরণ!—
আমার প্রিয়ার যেন বক্ষের অঞ্চল
ঢেকে দিল দেহ হিয়া ধরণী গগন!—
করে দিল সর্ব মন অধীর চঞ্চল!
বাড়াইনু আলিঙ্গন!—প্রিয়া আসে নাই
পাঠায়ে দিয়াছে শুধু প্রিয়ার স্বপন!
কাননের মাঝে শুধু পাখি গান গায়,
প্রাণ ছিল প্রিয়া লাগি প্রেম-প্রতীক্ষায়!

তারপর সন্ধ্যা গেল, আসিল রজনী!—
পরশি সকল দেহে প্রিয়ার কুন্তল
হিয়া মোর দিশাহারা! আঁধার ধরণী।
'ওগো ঢাক, ঢাক মোরে প্রসারি অঞ্চল!'
কোন শব্দ নাহি হায়! প্রিয়া আসে নাই—
প্রিয়ার কুন্তল-স্বপ্ন এসেছে রজনী!
তখন বহিল ক্ষুধা বসন্ত বাতাস,
তৃষার্ত ভরসা-ভরা ধরণী আকাশ!
তখনো গভীর রাত্রি ধরণী ছাইয়া!
প্রিয়ার গভীর সেই প্রেমের মতন!
পাখিরা কানন-শাখে ছিল ঘুমাইয়া!
ওকি—ওকি দেখা যায়—ছায়া না স্বপন?
এলোমেলো চুলে ওই প্রিয়া আসিয়াছে
আবেশে অঞ্চল তার ভূমে লুটাইয়া!
এখন যে প্রভাতের পাখি গান গায়,
প্রিয়া মোর চলি গেছে কখন কোথায়?

বসন্তের শেষে

জীবন স্বপ্নের মতো শূন্য হয়ে গেছে!
কিছু আর নাহি মোর ধরিতে ছুঁইতে।
কত স্বর্ণ, কত রত্ন পড়িয়া রহেছে,—
সাধ নাই, সাধ্য নাই, তুলিয়া লইতে।
তুমি যে সুধার পাত্র ধরিয়া সম্মুখে
সাধিছ আকুল নেত্রে করিবারে পান!—
গঠিত তোমার রাজ্য শত দুঃখে-সুখে
আমার সকলি শূন্য স্বপন সমান।
ভুলেছি কি? ভুলি নাই ভুলিনি তোমায়
ভুলি নাই সে দিনের বসন্ত রজনী!
কত সুখ-দুঃখ-ভরা বসন্তের বায়
পূর্ণ পালে বহে যেত অন্তর তরণী!
তবে প্রিয়ে আজ তুমি সত্য হয়ে এসে
সত্য কর এ জীবন বসন্তের শেষে!

আপনার গান

হে অন্তর! প্রভাহীন বাক্যদল মাঝে
কেমনে রচিব তব আনন্দ নিলয়?
সকল গগন ঘেরা জলদের মাঝে
শবদ নিশীথে যেন ম্লান চন্দ্রোদয়!
তব বক্ষে জ্বলিছে যে অপূর্ব আলোক
জগতের চক্ষে তাহা ক্ষীণতম ভাসে!
তোমার প্রদীপ হতে ওই যে আলোক
বাহিরে আসে না!—ওগো ছায়া শুধু আসে!
তব কুঞ্জে বাজে চির বসন্ত বাঁশরি
প্রতিদিন প্রতিরাত্র উন্মাদিয়া প্রাণ।—
দুটি ক্ষীণ ধ্বনিহীন ম্লান ছন্দ ভরি
কেমনে উঠিবে ফুটি সে গোপন গান?
আপনা ফিরাও তবে আপনার পানে!
আপনি আনন্দ পাবে আপনারি গানে।

স্বর্গের স্বপন

হে সুন্দরি! সেইদিন বসন্ত প্রভাতে
মনপ্রাণ অন্ধ করা সুবাসিত রাতে
ঝলসিলে আঁখি মোর, পরশিলে মন!
অবাক অন্তর তোমা করিল বরণ ;—
ভাল করে দেখে নাই করেনি জিজ্ঞাসা
প্রেমাতুরা প্রাণ, দিয়া সর্ব ভালোবাসা,
সেইদিন, সর্ব কাজে চিত্ত আনমনা,
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চনা!

আর সেই, সেইদিন বসন্ত বাতাস,
আপন আবেগে পূর্ণ নিশীথ আকাশ,
চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন,
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এ মন!—
অর্ধ নিমীলিত নেত্রে মনে হল মোর
স্বর্গ হতে নেমে এলে! জগতের ঘোর

ঢাকিলে স্বর্গের করে! গরবী পরান
করিল পূজার লাগি পুষ্প অর্ঘ দান!

সব মনে নাই, শুধু মনে আছে মোর,
উজ্জ্বল অধর তব অবাক বিভোর,
চরণে পরশি যেন অজানিত দেশ!—
নূতন রাজ্যের মাঝে আশ্চর্য অশেষ!
রহস্য মধুর হাসি! কৌতুকে অপার
পরিপূর্ণ দুই নেত্র!—প্রতি পত্রে তার
বিস্তারিত স্বর্গছায়া স্বরগের সুখ!
নিতান্তই স্বরগের ভাবিনু সে মুখ!
তারপব গেছে দিবা গেছে নিশা কত!
গিয়াছে স্বপনপ্রায় আশা শত শত,
প্রভাতেব মুক্ত বায়ু, শ্রান্ত রজনীর
অলস অঞ্চল-গন্ধ সুরভি সমীর,
এ মোব পরান 'পরে! সুখে-দুঃখে শোকে,
পরিম্লান ধরণীর মলিন আলোকে,
সম্পূর্ণ আঁধারে কভু, এ মোর জীবন
কত দীর্ঘ দিবানিশি করেছে যাপন!

হে মোর প্রভাত-পুষ্প, হে অপরিচিতা!
হে আমার যৌবনের পূর্ণ প্রস্ফুটিতা!
হে মোর মানস স্বর্গ, হে স্বপ্ন অঞ্চলা,
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা!
হে আনন্দ নিখিলের! হে শান্ত রঙ্গিণী!
হে আমার যৌবনের স্বপন সঙ্গিনী!
হে আমার আপনার! হে আমার পর!
হে আমার বাহিরের হে মোর অন্তর!

হে আমার, হে আমার চির মর্ম্মময়!
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয়!
আছিলে গোপনে মোর মন অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, আমারি পঞ্জর জুড়ে!
যেমনি বাজানু বাঁশি, সলাজ চরণে—
বাহিরিলে—দাঁড়াইলে—অপূর্ব ধরনে ;
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প মস্তকে গগন!—
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন!

উপহার

ফুটেছিল শত পুষ্প বিচিত্র বরণে,
ফুটেছিল নিভৃত এ অন্তর কাননে,
মুক্ত বায়ু রবিদীপ্ত প্রভাত প্রভায়,
পূরবী সঙ্গীত শ্রান্ত প্রশান্ত সন্ধ্যায়!
ফুটেছিল আলোকিত মধ্যাহ্ন গগনে
ফুটেছিল অন্ধকার নিশীথ পবনে,
কি আনন্দে কাঁপিত যে পাগল পরান
এ জগতে কেহ তার পায়নি সন্ধান!
তারপর তুমি এলে, দাঁড়াইলে হেসে!
সলাজ অন্তর মোর বাহিরিল শেষে ;—
বিশাল এ জগতের বন উপবনে
ফুটিল সে পুষ্পরাশি আছিল যা মনে!
ধর ধর সেই ফুলে সাজায়েছি ডালা
পর পর সেই ফুলে গাঁথিয়াছি মালা!

শূন্য প্রাণ

ওরে রে পাগল
জ্বলিছে নয়নে তব কি নব বাসনা,
কী গীত রয়েছে বাকি ;—কি নব বাজনা?
উচ্চারিত হয় নাই কি প্রেম-মন্তর,
কোন্ পূজা লাগি তব আকুল অন্তর?
আমি তো দিয়াছি যা কিছু আছিল সাব—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!

নিবিড় নয়ন হতে দিয়াছি দরশ,
এ শুভ্র দেহের আমি দিয়াছি পরশ,
পরানের প্রীতি পুষ্প, প্রতি হাসি গীত,
জীবন-যৌবন-ভরা সকল সঙ্গীত,
তোমারে করেছি দান! কি চাহ আবার,
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!

তোমারে করেছি পূজা, দেবতা সমান,
প্রভাতে মধ্যাহ্নে গাহি সুমঙ্গল গান ;

সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালি, ধূপ ধুনা দিয়া
আরতি করেছে মোর প্রেম পূর্ণ হিয়া!
আর কি করিব দান, কি আছে আবার
ওরে রে পাগল ওরে পাগল আমার।

সন্ধ্যা শেষে পুনর্বাব করেছি বরণ
সমস্ত রজনী ভরে করেছি স্মরণ,
তোমাবে তোমারে শুধু, হাসিয়া প্রভাতে
আনিয়াছি পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া দু-হাতে।
আর কি আনিতে পারি কি আছে আমার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার।

সকল ঐশ্বর্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি! কি দিব গো আনি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।
তবে কি মিটিবে আশ, চাহিবে না আর?
ওরে বে পাগল, ওরে পাগল আমার।

সাঁঝের ছায়ায়

ওগো আধ পবিচিত!
আধ-অজানিত
অতিথির প্রায়।—
এসেছ ভ্রমিয়া শেষে—
আমারি এ দেশে—
ধূসর ছায়ায়!

নয়ন অধর শ্রান্ত
কত সুখ-ক্লান্ত
প্রখর প্রভায়!

বক্ষে মোর রাখি মাথা
জুড়াইবে ব্যথা
শীতল সন্ধ্যায়?

অগ্নিরূপে চলে গেলে
    ভস্ম হয়ে এলে
        সাঁঝের বেলায় :

আমার যৌবনতপ্ত
    প্রেম অভিশপ্ত
        অন্তর মেলায়।

থাক বঁধু সেই ভালো!
    কাজ নাই আলো
        প্রভাত প্রভায়

যাহা আছে তাই দাও
    আঁখি পানে চাও
        সাঁঝের ছায়ায়।

প্রেম

এ প্রাণ আছিল শূন্য অলঙ্কার হীন,
তব প্রেম আজি তার বসন-ভূষণ ;
জড়ায়ে অন্তরে মোর প্রতি নিশি দিন
করিতেছে নগ্ন প্রাণে লজ্জা নিবারণ!
আমার হৃদয় ছিল সর্ব গীত হারা,
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী!—
সুখ-পূর্ণ, শান্তি-পূর্ণ অমৃতের ধারা—
করেছে জীবন মোর সঙ্গীত-বাহিনী!
সর্বসুখে বিভূষিত গরবিত প্রাণ
বক্ষেতে চাপিতে চায় সে প্রেম-গৌরব!
বৃথা আশা! বিশ্বমাঝে বেজে উঠে গান,
বাতাসে ভরিয়া যায় ফুলের সৌরভ!
তবে এস নমি মোরা দেবতা চরণে—
সেইখানে বাঁধা রব জীবনে-মরণে।

প্রেম সত্য

জ্ঞানচক্ষু দিয়ে
    তোমারে দেখিনে প্রিয়ে!
তোমারে দেখেছি শুধু
    হৃদি-নেত্র দিয়ে।
তাই মোর, এত ভালোবাসা!
বিচার করিলে, তুমি
    শুভ্র কি কালো?

বিচাব করিনে, তুমি
    মন্দ কি ভালো।
কাননেব পুষ্প-সম
    ওগো পুষ্প মম!
যে মুহূর্তে দেখিয়াছি
    বাসিযাছি ভালো!
তাই মোর, এত ভালোবাসা!

অনন্ত সরল নিত্য
    সত্য যে প্রকার
একেবারে মন প্রাণ
    করে অধিকার—
তুমি তো তেমনি করে
    মন প্রাণ ভবে
তব প্রেম সত্য রাজ্য
    কবেছ বিস্তার
তাই মোর, এত ভালোবাসা!

জ্ঞানচক্ষু দিয়ে
    তোমারে দেখিনি প্রিয়ে!
তোমারে দেখেছি শুধু—
    হৃদি-নেত্র দিয়ে!
তাই মোর, এত ভালোবাসা!

টান

রচনা বিভোর করি যেমন কবিয়া
আপন রচনাগুলি হাতে তুলি নিয়া
উলটি পালটি তারে পরান ভরিয়া
শতবার পড়ি-পড়ি করে সম্ভাষণ।—
সেইরূপ হে প্রেয়সী! আমিও তোমার
সৌন্দর্য সম্পদরাজি হেরি বারে বার,
শতবার চলে গিয়ে ফিরিয়া আবার
তব প্রেমমন্ত্র প্রিয়ে! করি উচ্চারণ!
কবিতা কবির আশা তাই তারে টানে
তুমি মোরে কিসে টান, কে জানে কে জানে!

দান

ওগো, আমাব প্রাণে যত প্রেম আছে
তোমারে করিনু দান ;
তুমি, নযন মুদিয়া, তুলিযা লইযো
ভরিও তোমার প্রাণ।
তুমি, সরমের বাধা মেনো না মেনো না
চেয়ো না কাহারো পানে ,
ওগো, এ প্রেম নির্মল ফুলের মতন
দেবতা সকলি জানে!

অন্তিমে

নিভিয়া গিয়াছে হাসি.
শুকায়ে এসেছে ফুল,
নিষ্প্রভ জীবন আজি,
মৃত্যুর এ কিরে ভুল।

যৌবন চলিয়া গেছে
স্বপন গিয়াছে তার,

চরাচরে ছেয়ে গেছে,
    পরানের অন্ধকার!

বঁধু নাই—বাঁশি নাই—
বৃন্দাবন? তাও নাই,
অন্তরের সাধগুলি,
    পুড়িয়া হয়েছে ছাই!

আজ শুধু মধু-স্মৃতি
    শ্মশানে কুসুম-সম,
পুরাতন জীর্ণ গৃহে,
    মলিন প্রদীপ মম।

মৃত-রবি-কর-রেখা,
    শুষ্ক ফুল সঙ্গে তার,
জীবন ভরিয়া মোর ;
    কাঁদে অন্ধ হাহাকার।

শুকায় শুকাক ফুল
থেমে যায়, যাক হাসি,
লক্ষ্যহীন অন্ধকারে,
    হৃদয় যাইবে ভাসি।

চাহি না শুনিতে আশে
    বসন্তের পুষ্পরানী,
ঢেল না শ্রবণে তব,
    বীণা-বিনিন্দিত বাণী।

জ্বেল না জীবনে আর
তোমার সোনার বাতি
আছে প্রাণে, থাক্-থাক্
    আমার আঁধার রাতি।

শতছিন্ন ছিদ্র বস্ত্র
পরিধানে আছে যার
কনক আলোক রেখা,
    লজ্জার কারণ তার।

ভাসিয়া গিয়াছে স্বপ্ন
ভুলিয়া যেতেছি গান

সাজে না জীবনে তার
    বসন্ত ব্যাকুল তান।

সকলি হারায়ে গেছে
জীবন দিয়াছি ছেড়ে—
আঁধার হৃদয় মাঝে,
    আঁধার গিয়াছে বেড়ে।

নিভিয়া এসেছে হাসি
    শুকায়ে এসেছে ফুল
বিধাতার একি লীলা,—
    মৃত্যুর একি রে ভুল।

রাগ

'রাগ করেছ কি'? ওগো! কার নাই রাগ
হৃদয়ে জ্বলিছে দেখ কত শত অনুরাগ!
কত না সুখের লাগি কত ভাবনায়,
কত না সুখের মাঝে কত বেদনায়,
সকল প্রভাত বেলা সারা দিনমান
কত না তোমার তরে কেঁদেছে পরান!
যেমনি আসিলে তুমি সারাদিন পরে
দাঁড়ালে আমার কাছে হাতখানি ধরে
সোহাগে সরমে মোর চোখে জল ভাসে
মরা দেহে ভরা-প্রাণে কথা নাহি আসে!
ব্যথাভরা আঁখি দিয়ে চেয়ে আছি তাই
ভাবিছি আমারে আমি কেমনে বুঝাই!
রাগ করি নাই ওগো! করি নাই রাগ।
আমার যে পোড়া প্রাণে ভরা অনুরাগ!

প্রাণের স্বপ্ন

নীবব আঁধার নিশীথ সমীর
বিমল আকাশ—জীবন অধীর
আনত ভূমে!
শত সুখ-দুঃখ, আছিল ফুটিয়া
পবান আমার পড়েছে লুটিয়া
আজি ঘোর ঘুমে।
গেছে দুঃখ আজ গেছে ভয় লাজ
গেছে ভেঙে সুখ—শত শত কাজ
শুধু স্বপ্ন চুমে!
আজিকে সত্যের কল্পনা কাহিনী
সকলি অলীক,—বিরামদায়িনী,
স্বপনের ধূমে
শুধু আশা চুমে!
যদি যায় যাক্—জীবন ভাসিয়া
যদি আসে থাক্ মরণ জাগিয়া
বিজড়িত ঘুমে
শুধু স্বপ্ন চুমে।

মহাশূন্য

জীবন, জীবন কোথা?—যেন নিরবধি,
মরণ নিঃশ্বাস বহে অতৃপ্তি লইয়া,
যেন চুপি চুপি অই—কাঁদাইছে হৃদি,
অতীত সে জীবনের প্রতিধ্বনি দিয়া।

জীবন, জীবন কোথা? ভ্রান্তি স্বপনের,
দৃপ্ত সুরা পান করে শুধু ভুলে থাকা!
একি হাসি একি কান্না! শুধু বসে বসে
ভবিষ্যের চিত্রপটে অতীতেরে আঁকা!

মহান মুহূর্ত এক জীবনে পশিয়া
ভাসাইয়া লয়ে গেছে—গ্রাসিছে সকল।
কোথা তুমি কোথা আমি,—গেছে হারাইয়া
রয়েছে অনন্ত ব্যথা হৃদয় সম্বল।

সে ব্যথা বাজিছে আজো ; আমার জীবন
তারি যেন প্রতিধবনি, আর কিছু নয়!
যত হাসি যত অশ্রু—যাতনা স্বপন,
করেছে জীবন যেন মহাশূন্যময়।

স্বপ্নে

এত করে বাঁধি বুক,
কেন ভেঙে যায়?
জীবনের মহাব্রত স্বপনে মিলায়।
একটি প্রভাত লাগি
এতকাল ছিনু জাগি,
আজি এ সাঁঝের মাঝে
পড়েছি ঘুমায়ে!
অবশ শিথিল দেহ
নাহি দুঃখ নাহি গেহ
ভাঙিয়া গিয়াছে হৃদি
পড়িয়াছি নুয়ে।
অই তো উষার হাসি,
আকাশে উঠিছে ভাসি,
আকাশ স্বরগ এই আছিল আমার!

আজি জাগিয়াছি তবে,
পূরেছে বাসনা ভবে,
এইবারে ডেকে লও দেবতা আমার।

নানা স্বপনের মায়া,
হৃদয়ে ফেলেছে ছায়া,
এ নহে উষার হাসি—নিশি আঁধিয়ার
নিরাশ কম্পিত হৃদে স্মৃতি সাধনার।

মোছ আঁখি

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন?
অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম কলি নয়ন কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভবা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা ;
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

বিদায়

বসেছিনু তোমা তরে ওগো সারারাতি
চাঁদের আলোয় আর প্রাণের খেলায় ;
কখন ঘুমালে তুমি নিবাইলে বাতি!
এখনো বসিয়া আছি ভোরের বেলায়
তোমারি দুয়ারে প্রিয়ে! ঘুমাও ঘুমাও
করুণ উষায় লব নীরব বিদায়!
যদি ভেঙে যায় ঘুম দেখিবারে পাও
অকস্মাৎ মনে পড়ে প্রভাত বেলায়!
কি জানি কি কহিবে গো! কি গীত গাহিবে!
পলকে টুটিয়া যাবে স্বপন আমার!
কি জানি কি গাহিবে গো! কি ব্যথা বাজিবে!
অজানা তরাসে প্রাণ কাঁপিছে আবার!
ঘুমাও ঘুমাও তব স্বপ্ন মহিমায়!
করুণ উষায় লব নীরব বিদায়!

কামনা

আমি নই, আমি নই! হে পূর্ণ সুন্দরী,—
সত্যই আমার তুমি নহ কামনার ;
কি শুনিতে কি শুনেছ! মরিছে গুমরি,
আমারি পঞ্জর মাঝে, গীত বাসনার।
মোহ মুগ্ধ লাজ দীপ্ত গীত বাসনার।

আমি নই! আমি নই! নব শিশু সম,
জন্মেছে মরমে মোর এ নব বাসনা,
নয়ন আলোকে তব! ক্ষম মোরে ক্ষম,
এ নহে এ নহে আমি, এ কোন কামনা
অযাচিত আশাতীত, এ কোন কামনা!

চুম্বন

আমার চুম্বন এক চঞ্চল বিহঙ্গ
নিমেষে উড়িয়া যায় তব মুখপানে!
উড়াযে আরক্ত পাখা ভাসাইয়া অঙ্গ!
যত ডাকি আয়! আয়! পরিচিত তানে
শুনে না সে! ঠেলি ঠেলি নীলিম-তরঙ্গ
যতদূরে তুমি আছ তত দূরে যায়!
কাছে গিয়া মুগ্ধ-হিয়া আমারি বিহঙ্গ
স্বর্গ হতে ফিরে আসে পাগলের প্রায়!

আমার মন

ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,—
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
    চক্ষে দিব চুমা!—
    মন তুই ঘুমা।

গগনে গরজে ঘন,
    আঁধার ধরণী!
কোথা যাবি অন্ধকারে
    পাগলের মণি?

ওরে মন তুই ঘুমা
ওবে মন তুই ঘুমা
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
    চক্ষে দিব চুমা,
    মন তুই ঘুমা!

কার চো'খ আলো জাগে?
কারে তোর ভালো লাগে?
কোন্ রত্ন—কোন্ হেম?
কার যত্ন—কার প্রেম?
    সংসারে সকলি মন
    —দু-দিনের ধূমা!

ওবে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,
তোরে বক্ষ হতে সুধা দেব
    চক্ষে দিব চুমা,
    মন তুই ঘুমা।

কে তোরে বাসিবে ভালো
    আমার মতন?
কে তোরে করিবে আর
    এত বা যতন?

মেলিস্ না পক্ষ তোর
    বে মোব বিহঙ্গ!
বাহিবে গর্জিছে শত
    আঁধার তরঙ্গ!

অনন্ত অচেনা দেশ—
    কোথা যাস্ ভাসি?
বক্ষেতে লুকায়ে থাক্
    চির বক্ষবাসী!

ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা
মন তুই ঘুমা।

তুমি

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্ব জীবনের
চির প্রেমার্জিত শত তপস্যার ফল!
ওগো প্রিয় তুমি মোর পূর্ণ মরণের
সহস্র আসন্ন আশা সহায় সম্বল
নিতান্ত আমারি তুমি।

তুমি আছ দাঁড়াইয়া বিরাট অটল,
অতি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তব স্বর্গপানে ধায়!
সমস্ত জীবন তব সম্পূর্ণ সফল,
আমি আছি তোমারি ও চরণের ছায়
তোমারি চরণ চুমি!

যদি কোনদিন তব উজ্জ্বল নয়ন
হেথায় ফিরিয়া আসে দেব স্বপ্ন-ভুলে!
আমি তাই পাতিয়াছি আমার শয়ন
চেয়ে দেখ তোমারি ও চরণের মূলে
নিষ্ফল কোরোনা মোরে!

খুলিয়া হৃদয় দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য আছে, যত না স্বপন ;
সর্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি করো ওগো করো আমার জীবন
তোমার চরণভূমি!

তুমি ও আমি

আমার এ প্রেম মোর চিত্ত হতে এসে,
তোমারি লাবণ্য মাঝে নিত্য খেলা করে,
কৌতূহল দীপ্ত আঁখি, সুখশ্রান্তি শেষে,
আবার তোমারি বক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে।

আমার আকাঙ্ক্ষা সখি! পতঙ্গের মতো
দিবসে নিশীথে শুধু দগ্ধ হতে চায়,
ঢলিয়া পড়িছে তব সর্বাঙ্গ সতত,
অতৃপ্তের তৃপ্তি লাগি উন্মত্তের প্রায়।
আমার এ মন সখি! মুগ্ধ কবিসম,
সর্বদা করিছে শত সঙ্গীত রচনা,
গাঁথি গাঁথি সুখ দুঃখ পুষ্প অনুপম,
আপনি চরণে তব ঢালিছে আপনা।

তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি
দুজনার মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি!

আপনার মাঝে

(১)
ওরে রে অশান্ত মন!
কারে তুই চাস্?
আজি এ সন্ধ্যার মাঝে
কোথা তুই যাস্?
ভুবন ভ্রমিয়া এলি
কোথাও কি পেলি!
মিছে তবে কেন তুই
ঘুরিয়া বেড়াস্?
সুখ হীন শান্তি হীন
ঘুরিয়া বেড়াস্।
আপন হৃদয়ে তবু
খুঁজেছিস্ কভু?—

আপন মরম তলে
পাস্ কিনা পাস্।
সকল ভুবন ঘুরি
যারে তুই চাস্?

(২)

ওরে পাখি, সন্ধ্যা হল আয়রে কুলায়!
সমস্ত গগন ভরে
আঁধার পড়িছে ঝরে
ওরে পাখি! অন্ধকারে! নীড়ে ফিরে আয়!
বন্ধ কর পক্ষ তোর আয় রে কুলায়।
যতক্ষণ আলো ছিল মিটে নি কি আশ?
ওরে সারা দিনমান
তুই করেছিস্ পান,
যত মধু ছিল ভরি গগন আকাশ
এবে আলো সাঙ্গ হল মিটেনি পিয়াস?

ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে,
ওরে বন্ধ কর পাখা,
অপূর্ব আলোক মাখা,
অনন্ত গগনতল হেথায় বিরাজে!—
ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে।

(৩)

ভয় নাই ভয় নাই হে আমার মন!
এ যে শুধু ক্ষণিকের মোহ অন্ধকার!
আবৃত অন্তরে তোরা জ্যোতিঃ চিরন্তন
ডুব দে ডুব দে তবে আপন মাঝার।
পূর্ণ কর্ ওরে পাখি! পক্ষ দুটি তোর
আপন আনন্দে-ভরা আত্মার আলোকে,
আপনারি জ্ঞানে হয়ে আপনি বিভোর
অন্তর গগন তলে উড়িস্ পুলকে।

ব্রহ্মাণ্ডে পড়িবে তোর চরণের ছায়া
বাসনা বিলুপ্ত হবে আত্মার মাঝারে,
দুই হাতে ছিন্ন করি শত মিথ্যা মায়া
আপনার মহিমার দুন্দুভি বাজা রে।

ভয় নাই ভয় নাই, রে আমার হিয়া,
মুহূর্তের ভ্রান্তি শুধু আনিছে আঁধার!
জীবনের জ্যোতির্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া
দেখা রে আপন পথ আপন মাঝার।

(৪)

তবু যে তরাসে কাঁপে শ্রান্ত হিয়াখানি
আপনার অন্তরের পথ নাহি জানি!
সম্মুখে পশ্চাতে তার
অন্তহীন অন্ধকার
ঘিরিছে সতত তারে ঘন আবরণে,—
এই ঘোর অন্তরের অন্ধকার বনে।

ভয় নাই ওরে মন! কর্ রে নির্ভর
অন্ধকারাক্রান্ত এই আপনারি 'পর!—
এই যে আঁধাররাজি
নয়ন ভরিছে আজি,
এরি মাঝে পাবি তুই আত্ম-পরিচয়
মুহূর্তের ভ্রান্তি শুধু আর কিছু নয়!

নিবেদন

হে মোর বিজয়ী রাজা! এস তবে আজ
সময় উল্লাস-ভরা বিজয় হুঙ্কারে!—
দর্পভরে সগৌরবে ওগো রাজরাজ!
এস আজ রুদ্ধ এই অন্তর দুয়ারে!
ছিন্ন কর বক্ষ মোর কৃপাণে তোমার
চূর্ণ করে দাও মোর সোনার মন্দির!
ধূলিসাৎ হয়ে যাক হৃদয়-আধার,
বিজয় দুন্দুভি তব বাজুক গম্ভীব!
আমি অশ্রুজল চোখে পরাইব আজ
জয়মাল্য তব কণ্ঠে ওগো রাজরাজ!

প্রার্থনা

নিখিলের প্রাণ তুমি! তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার ;

জাগরণে কর্ম্মভূমি,
শয়নের স্বপ্ন তুমি,
ওগো সর্বপ্রাণময়! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার!
নিয়ো পাপ নিয়ো পূণ্য—
হৃদয় করিয়ো শুন্য
ভরি দিয়ো শুন্যপ্রাণ তব পূর্ণতায়!
মহান করিয়া দিয়ো তব মহিমায়।
আমারে জড়ায়ে নিয়ো
আমারে ঢাকিয়া দিয়ো
ওগো মহা আবরণ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার!

গান

আমার পরান ভরি উঠে যত গান
তোমার পরান হতে পায় যেন প্রাণ!
হে অনন্ত! হে মহান! তুমি প্রাণসিন্ধু!
পরান তরঙ্গে তব আমি প্রাণবিন্দু!
আমারে ভাসায়ে রাখ পরান পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ-হরশে
আজিকে ডুবুক যত ছোট খাট গান
ওই তব মহাগানে। ওগো মোর প্রাণ!
ওগো প্রাণস্পর্শি! করহ পরশ মোরে।
তোমার অনন্ত গানে প্রাণ যাক ভরে।

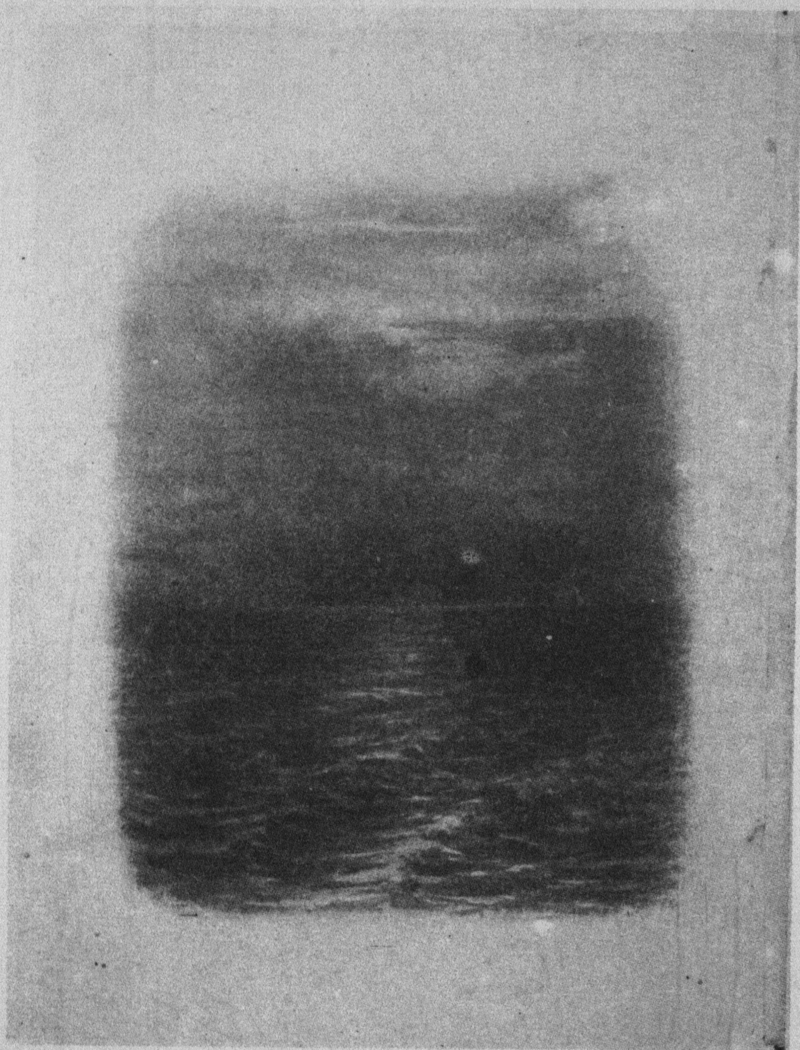
নীরবতা

আজি শান্ত হিমগিরি, শান্ত তরুলতা!
প্রশান্ত গগনকোলে তপন জ্বলিছে!
পরান মন্দিরে আজি মহানীরবতা
হে নীরব! হে মহান্! তোমারে বরিছে!
পূর্ণ করে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তরনিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে!

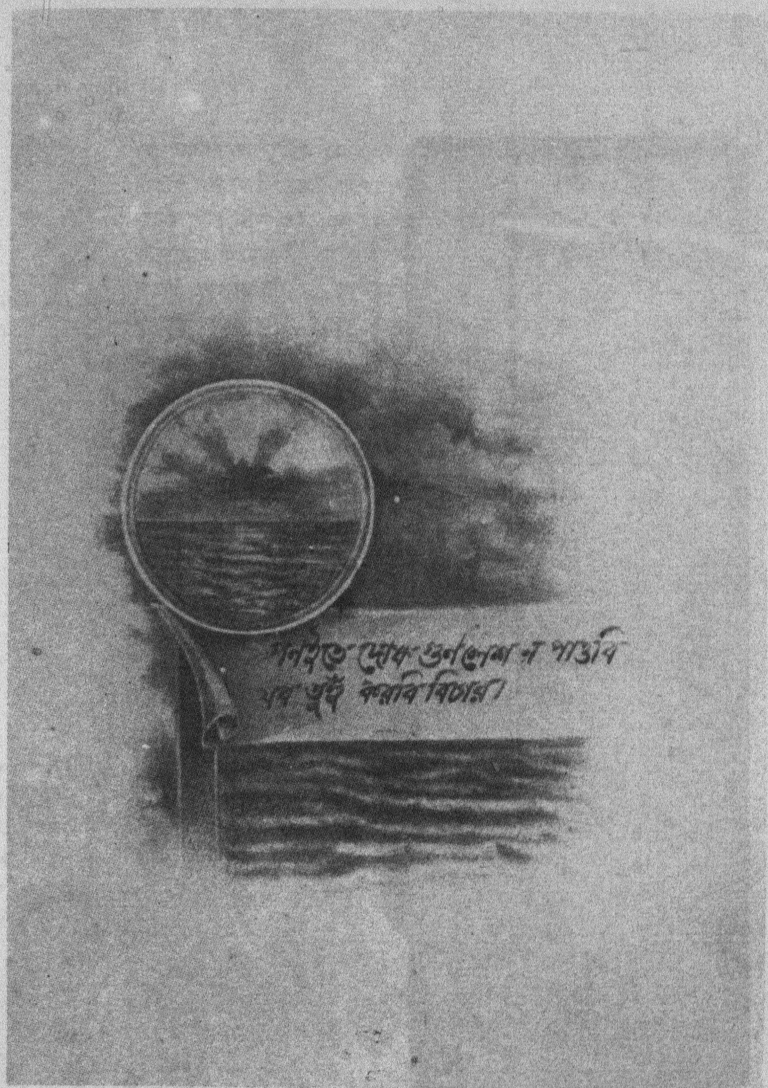
সাগর সঙ্গীত
১৯১৩



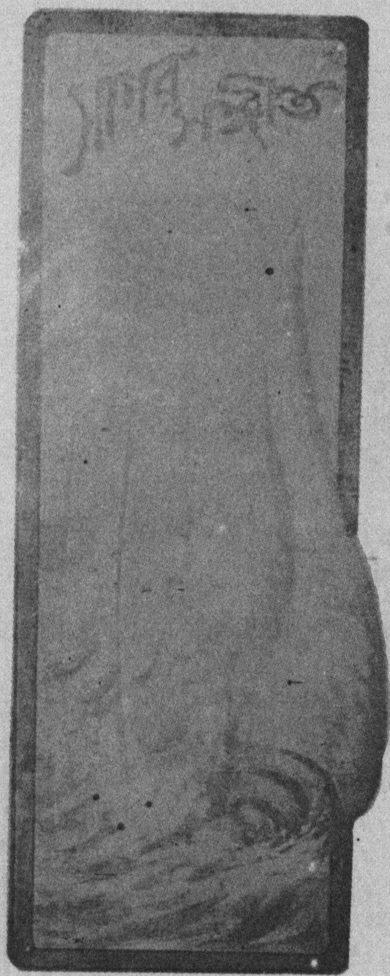
সাগর সঙ্গীতের (১৯১৩) আখ্যাপত্র



সাগর সঙ্গীতের (১৯১৩) একটি আর্টপ্লেট



সাগর সঙ্গীতের (১৯১৩) উৎসর্গ-পত্র



সাগর সঙ্গীতের (১৯১৩) রাজ-সংস্করণের পৃষ্ঠা-নির্দেশক

হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক। তোমা, ছন্দে গেঁথে লই!
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টলমল কি যে স্বপ্ন ভরে!
সত্যই এসেছে যদি হে রহস্যময়ি!
দাঁড়াও অন্তর মাঝে, ছন্দে গেঁথে লই।
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি অর্ণবের গানে,
পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের তানে,
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব!
তুমি কি রবে না সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা!
ছন্দবন্ধ, পরিপূর্ণ, নিত্য অচঞ্চলা!

*

গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি
যত তুহুঁ করবি বিচার।

কবির হস্তাক্ষরে সাগর সঙ্গীতের ভূমিকা-কবিতা

সাগর সঙ্গীত

১

আজিকে পাতিয়া কান,
শুনিছি তোমার গান,
হে অর্ণব! আলো-ঘেরা প্রভাতের মাঝেঃ
একি কথা! একি সুর!
প্রাণ মোর ভরপুর,
বুঝিতে পারি না তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে!

২

ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি ও গানে!
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।
কখনো বাজিছে ধীর,
কখনো গভীর,
কখনো করুণ অতি, চোখে আনে জল,
উদ্দাম উম্মাদ কভু করিছে পাগল!

তোমার গীতের মাঝে,
কি জানি কি বাজে!
তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে,–
আমার সকল অঙ্গ শিহরে, শিহরে!
ওই তব পরানের অন্তহীন তানে ;
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।

৩

ওই তো বেজেছে তব প্রভাতের বাঁশি
আনন্দে উৎসবে ভরা! সূর্যকর রাশি
তোমার সর্বাঙ্গে আজ আনন্দে লুটায়,
উজল উছল জলে কুসুম ফুটায়!

গীতভরা স্বর্ণালোকে ফুটে পুষ্পদল,
তোমার চরণ বেড়ি করে টলমল।
তোমার সঙ্গীত আজি বিহঙ্গের প্রায়,
মাখি সে সোনার স্বপ্ন তার সর্ব গায়,
উড়িয়া বেড়ায় মোর হৃদয় আকাশে,
প্রেমের তরঙ্গে আর বসন্ত বাতাসে!

৪

কোথায় রাখিব আজ এ সুখের ভার,
কারে দিব আজ মোর অশ্রু উপহার।
এই অজানিত সুখ, এ দুঃখ অজানা,—
বাধাহীন এ উৎসবে, মানে না যে মানা।
সকল সুখের রাশি পুষ্প হয়ে ফুটে,
সব দুঃখ আজ মোর, গীত হয়ে উঠে!

বিচিত্র এ গীত লোক, পুষ্পের কানন!—
কি জানি কেমন করে কাঁপিছে এমন!—
কোথায় রাখিব বল অন্তরের ভার,
তোমার উৎসবে আজি, হে সিন্ধু আমার!

৫

তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে,
সোনার স্বপন-ভরা প্রভাতের মাঝে ;
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার,
গগনে পবনে বহে সেই গীত ধার।

কি মোরে করেছ আজ! মনখানি মম,
শত-শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র-সম,—
পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
গরবে গৌরবে আজ উঠিছে বাজিয়া।

৬

এই তো এসেছে উষা অনন্তে ভাসিয়া,
স্বপ্নসম শুভ্রালোক অঙ্গে জড়াইয়া,
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝরিয়া পড়িছে,
শুভ্র এই স্বপ্নালোকে স্বপন রচিছে।
পূর্ণ আজ এ আলোকে সকল আকাশ,
অনন্ত সঙ্গীত মাঝে নীরব বাতাস!

নিঙাড়ি ও বক্ষ-ভরা সর্ব আকুলতা,
গীত ধ্যানে রচিতেছ শব্দ নীরবতা!
হে গায়ক অনন্তের! কোথা গীত বাজে?
শব্দহীন কোন্ লোকে? কোন্ উষা মাঝে?

৭

জানি না কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানি না গানের সুর, তান লয় মান,
আমার অন্তর তলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়া ভরা আমার পরান!

সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে, সাঁজের আঁধারে।
তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয় দুয়ার,
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে!
অপূর্ব এ মিলনের গোটাকত গীতে
পরান ভরেছি আজ তব পায়ে দিতে!

৮

তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,—
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ!
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী!—বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে,
বাজাও নির্জন তীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়,—
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায়!
ওগো যন্ত্রি! আমি যন্ত্র, বাজাও আমারে,—
তোমার অপূর্ব এই আলো অন্ধকারে!

৯

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে!
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে।
আমার পরান ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন!
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল!

সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু! দিবস যামিনী!

১০

অপূর্ব এ গীতলোকে উড়িয়া বেড়ায়
সঙ্গীত আকুল হৃদি বিহঙ্গের প্রায়!
কোনকালে কোনখানে অন্ত নাহি পাই,
অনন্ত এ গীতলোকে উড়িয়া বেড়াই!
অনন্ত শবদ-ভরা অকূল নির্জন,
বিচিত্র এ সঙ্গীতের নীরব গর্জন।

অনন্ত এ গীতলোকে আপনা ডুবাই
কোনকালে কোনখানে তল নাহি পাই।
হে অতল! হে অগাধ সঙ্গীত মণ্ডল!
কি শব্দে নিঃশব্দে ফোটে চিত্ত শতদল!

১১

ওগো চিত্রকর কত রঙ্গে রচিতেছ,
কত বর্ণে বর্ণে তুমি ফুটায়ে তুলেছ
তোমার কুসুম কুঞ্জে অপরূপ ফুল!
অপূর্ব আলোকে তব ঐশ্বর্যে অতুল!
আঁখি মোর ছুটিতেছে দরশ লোলুপ
ঘিরিয়া ঘিরিয়া তব পুষ্প অপরূপ!
চাহি না কুসুম কুঞ্জ চাহি শুধু গান,
শবদ তরঙ্গে আমি ভাসাইব প্রাণ!
তবে দাও দাও মোরে দাও ডুবাইয়া,
সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া,
আমার নয়ন পটে! আমি অন্ধ হব,
শবদ সাগর মাঝে আমি ডুবে রব!
আর কিছু রহিবে না। ভুবন মণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিবে কেবল।

১২

কি আজ ভাসিছে তব বক্ষ পরকাশি
উজ্জ্বল স্বপ্নের মতো পরিপূর্ণ চাঁদে!
কি অনন্ত শান্তিভরা জোছনার রাশি,
পরানে ঝঙ্কারি উঠে আনন্দে, অবাধে!

পূর্ব জনমের একি স্বপনের ছায়া,
কোন্ পূর্ব পুণ্যফলে উঠেছে ভাসিয়া
তোমার হৃদয়তলে! কোন্ পূর্ব মায়া
রচিতেছে স্বপ্ন তব জীবনে জাগিয়া!
আমার পরান আজি, কাঁপিছে কেবল
জোছনা তরঙ্গে শত স্মৃতি পুষ্পদল।
শত জনমের যেন হাসি অশ্রুভারে,
পরান উঠেছে গাহি গীত পারাবারে।
সকল জনম যেন এক হয়ে গেছে,
একটি পুষ্পের মতো স্বপ্নে ভাসিতেছে।

১৩

আজি মেঘপূর্ণ দিন ধূসর আঁধার।
তরঙ্গ তরঙ্গ 'পরে ঝাঁপায়ে পড়িছে
অশান্ত বেদনা ভরে দুলিছে ফুলিছে,
কাঁপিছে গর্জিছে যেন মহা হাহাকার!
আজি যে আকাশ ভরা ধূসর আঁধার!
আজি যে বক্ষের মাঝে মহা হাহাকার!
একি সুখ? একি দুঃখ,—প্রণয় গভীর
একি? উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত, অধীর!
কি গাহিছে, কি চাহিছে, হৃদয় আমার
আজি যে আকাশ ভরা ধূসর আঁধার!

১৪

আজি যে আঁধার ভরা তোমার আকাশ।
আজি যে পাগল করা তোমার বাতাস।
আজি যে ফেলেছে ছায়া প্রলয় তুফান
তোমার আঁধার বুকে। আজি তব গান
অন্তহীন দিশাহারা, উন্মাদের মতো
আমার হৃদয়তলে গরজে সতত।
তবে এস, ভেসে এস, উন্মাদ আমার!
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব, ডুবিব, আজ প্রলয় আভাসে,
মরণ আঁধার ভরা আকাশে বাতাসে!

১৫

এ নহে স্বপন কুঞ্জে কুসুমের হার,
এ নহে কোমল যন্ত্রে মধুর ঝঙ্কার।
এ যে গো নির্দয় রুদ্র! মরণের রঙ্গে,
চরাচর ডুবে যায় প্রলয় তরঙ্গে!
ঘন ঘোর অট্টহাসে মরণ-ডম্বরে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড় পাতালে অম্বরে ;
বিদ্যুৎ বিহীন নিশা অশনি বরজে
ছিন্ন ভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে!
উন্মত্ত তরঙ্গে তব অযুত ফণিনী
বিস্তারি অসংখ্য ফণা অনন্ত রঙ্গিণী
ঘন ঘোর ঝঞ্ঝা বায়ু আঁধার পরশে
ভীষণ-ভৈরব একি প্রলয় বরষে!
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্দ্রিছে মবণ গীতি অনন্ত আঁধারে।

১৬

অনন্ত এ প্রভঞ্জন মোর বক্ষ ভরি
ছিন্ন পাল ভগ্ন হাল ডুবে মনতরী!
প্রলয়পয়োধি জলে মরণের পারে
আশ্রয় বিহীন প্রাণ অনন্ত আঁধারে!
এস তবে মৃত্যুরূপে ওগো সিন্ধুরাজ!
অবারিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আজ।

১৭

হে রুদ্র মরণদেব! জটী জটাধর!
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর! সংহর!
জীবনেরে ছেড়ে দাও বাঁচিতে মরিতে,
আপন হৃদয় কুঞ্জে আপনারি গীতে!
অনাদি কালের বক্ষে সৃষ্টি শতদল,
আপনারি সুখে দুঃখে করে টলমল,
অনন্ত সঙ্গীত ঘেরা গগনের তলে
তোমার সঙ্গীত ভরা তরঙ্গিত জলে।
তাহারে ছাড়িয়া দাও ফুটিতে ঝরিতে,
হে রুদ্র প্রলয় সিন্ধু!—বাঁচিতে মরিতে

১৮

রাখ, রাখ, রথ তব, হে অন্ধ বিজয়ী,
নামাও হস্তের অস্ত্র, সন্ধ্যা আসে ওই,
শান্তিময়ী, ধীরে ধীরে, মৃদুল চরণে,
গগন ভরিয়া গেল ধূসর বরণে!
রাখ রথ! শান্ত হও! ওগো রণশ্রান্ত!
হে মোর বিজয়ী বীর, হে আমার ক্লান্ত!

আমার পরান তরে বৃথা যুদ্ধ করা
আমি তো আপনা হতে দিতেছিনু ধরা!
জ্বেলে দিব সন্ধ্যাদীপ তোমার পরানে
হৃদয় মন্দির তব ভরি দিব গানে।
পাতিব তোমার তরে শয্যা সুশীতল
তোমার চরণ তলে রবে শান্তি জল।
আমার পরান তরে মিছে যুদ্ধ করা
আমি যে আপনা হতে দিতেছিনু ধরা!

১৯

আবার ফিরেছ প্রভু! হৃদয় গহনে
ফলে ফুলে পরিপূর্ণ আনন্দ পবনে!
থেমে গেছে আজ তব প্রলয় সঙ্গীত,
অধরে নয়নে ভাসে জীবন ইঙ্গিত।
আমি চেয়ে আছি তব প্রভাতের পানে
কি আনন্দ বহে যায় পরানে-পরানে!
সঙ্গীত উন্মুখ প্রাণ ফুটিবে এখনি!—
হৃদয় ভরিবে গানে, ডাকিবে যখনি!—
তোমার সঙ্গীত ঘেরা ঝঙ্কৃত গগনে,
তোমার কুসুম ভরা পুষ্পিত পবনে!

২০

তরুণ উষার আলো প্রতি অঙ্গে তব,
সোনার ঢেউয়ের মতো বহে চলে যায়,
উজলি উছলি উঠে স্বপ্ন নব নব—
দুলিতেছ আজ তুমি সোনার দোলায়।
আজি যে সেজেছ সিন্ধু, রাজার মতন।
সোনার তরঙ্গে বহে প্রেম আপনার ;
তরুণ প্রেমিক এক রাজার মতন—
সোনায় ভরিয়া গেছে হৃদয় আমার।

উষার আলোকে ভরা পরান এনেছি
রেখে যাব আজ তব চরণ তলায়,
সোনার কমলে আমি মালিকা গেঁথেছি,
দোলাইব আজ তব সোনার গলায়,
এক সূত্রে বাঁধা রব আমবা দুজনে
তরুণ উষার কোলে স্বপন বিজনে।

২১

আজি যে আকাশ গাহে করুণ সুরে!
হৃদয় উদাস করা করুণ সুরে!
মেঘেরা কি কথা কহে, বাতাস কাঁদিয়া বহে
সাগর চুমিয়া আর গগন ঘুবে—
করুণ সুবে।

আজি যে পরান মোর বাজিয়া উঠেছে ঘোব,
করুণ সুরে।

কিবা খোঁজে কিবা চায়, কোথা থাকে কোথা যায়,
দূবে অদূরে।

ওই যে মেঘের পানে, ছুটে যায় কোন্ টানে
গাহিছে সকল প্রাণে
করুণ সুরে।

নাহি ছন্দ নাহি তান
পরান পুরে—
আজি যে আকাশ ভরা করুণ সুরে।

২২

ঘুমাও ঘুমাও এবে হে সিন্ধু আমাব!
নির্জন গগনতলে, গীত শ্রান্ত চোখে।
মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ চারিধার।
ঘুমাও ঘুমাও এই স্তিমিত আলোকে।

আমি বসে আছি একা এপারে তোমার,
দুই চোখে চেয়ে আছি তব মুখপানে!—
ঘুমাও-ঘুমাও তুমি। হৃদয় আমার
জাগিছে কাঁপিছে কোন শব্দহীন গানে।

কবে পাব পরিচয় হে বন্ধু আমার!
কখন জাগিবে তুমি? কোন্ গীত মাঝে?
আমি রব প্রতীক্ষায়। দু-হাত তোমার
বাড়াইয়া দিয়ো তবে অন্ধকার সাঁঝে।

২৩

কবে দেখেছিনু তোমা,—হাতে ধরেছিনু,
চেয়েছিনু চোখে? কোন্ কালে কোন্ দেশে
সে দিন কি তব সাথে কথা কয়েছিনু—
তুমি গেয়েছিলে গান? চেয়েছিলে হেসে?
সে দিন কি ছিল প্রাণ এত ভরপুর
গভীর আবেগ ভরা এত অশ্রুজলে?

এত কথা এত ব্যথা ওগো এত সুর
সেদিন কি বেজেছিল পরান অতলে?
আমারে কি ধরেছিলে বক্ষে আঁকড়িয়া
স্নেহার্ত বন্ধুর মতো দু-হাতে তোমার?
আমার সকল কথা গেছিল ভাসিয়া
প্রেমের মোহন মন্ত্রে হৃদয় তোমার?

ওগো সব মনে নাই। শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন্ দেশে।—
তোমার পরশখানি মনে জেগে রয়,
এতকাল পরে তাই আসিয়াছি ভেসে।
মনে হয় আজি কোন গুপ্ত অভিসারে
ভালো করে দেখা হবে, হবে পরিচয়
যেন কোন মন্ত্রময় আলোক-আঁধারে
জাগিবে মোদের সেই পুরানো প্রণয়।

২৪

এখনো জাগেনি কেহ, আমি জাগিয়াছি
নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়,
এখনো উঠেনি রবি আমি উঠিয়াছি
সিনান করিব তব প্রাণ মহিমায়।
বাহিরের গীত রবে, বাহিরে পড়িয়া,
সবাই শুনে যা সে তো সবাকার তরে।—
দিয়ো মোরে লয়ে যাব হৃদয় ভরিয়া
যে গীত অতলে তব দিবানিশি ঝরে।

হে সিন্ধু! হে বন্ধু! ওগো তাই আসিয়াছি
সে গীত বাজিবে বলে আজি জাগিয়াছি।

২৫

এখনো ওঠে নি রবি, মোহন আঁধার
ঘিরেছে তোমারে যেন স্নেহ আবরণে।—
প্রশান্ত অধর আর নয়ন তোমার
কিবা নিদ্রা, কিবা স্বপ্ন, কিবা জাগরণে!
কি শান্ত সুন্দর চোখে, অর্ণব আমার!
চাহিছ আমার পানে এ মোহ আঁধারে।
কথা মোর, ভাষা মোর, সঙ্গীত আমার,
স্তব্ধ হয়ে গেছে এই সন্ধ্যার মাঝারে।
আমি আছি তব ছোট ভাইটির মতো
আমারে স্নেহের-চোখে দেখ মাঝে মাঝে।
যে সঙ্গীত বাজিছে তব বক্ষে অবিরত
আমার পরানে যেন মাঝে মাঝে বাজে।—

২৬

রবিকর পড়িয়াছে অধরে তোমার
প্রশান্ত গভীর তব গৌরবের মতো।
আমারি অন্তর হতে লইয়া আমার
সোনার স্বপন ঘেরা পুষ্প শত শত
কণ্ঠে দেছ উপহার। আমি শূন্য হাতে
আসিয়াছি তব পারে। হে সিন্ধু আমার!
শুনাও একটি গীত। মোর প্রাণপাতে
ঢালি দেয়ো অন্তহীন অমৃতের ধার
চিরদিন চিরকাল প্রতিধ্বনি তার
বাজিবে উজ্জ্বল করি অন্তর আমার।
আজ হতে আমি, হে অর্ণব! হে অশেষ!
গাহিব তোমার গান ফিরি দেশ-দেশ।

২৭

থাক্ থাক্ আজ নয়। এত লোক মাঝে
যে গান সকলে শুনে সেই গান গাও ;
এরা তো সেজেছে আজ প্রমোদের সাজে
এদের হৃদয় লয়ে হাসাও নাচাও।

যবে অন্ধকার আসি ঢাকিবে তোমায়
থেমে যাবে হেথাকার হাসির লহরি
দুই জনে মিলিব হে! গাব দুজনায়
চারিদিকে অন্ধকার রহিবে প্রহরী।
তুমি এক গান গাবে আমি গাব আর
দুজনে ভাসিয়া যাব অনন্ত হরষে!
তোমার অন্তর হতে অমৃতের ধার
আমারে ডুবায়ে দিবে তোমার পরশে।
দুই জনে মিলিব হে!—গাব দুজনায়
আঁধার রজনী যবে ঢাকিবে তোমায়।

২৮

ওগো কত কাল ধরে বহিতেছ তুমি
এ গীত বেদনারাশি হৃদয় ভরিয়া।
কত জন্ম জন্মান্তর,
কত যুগ যুগান্তর।—
ওগো কত যুগ হতে ওই চিত্ত চুমি
এ গান ধ্বনিছে বিশ্ব পাগল করিয়া—
কত যুগ যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর।
হে অনাদি, হে অনন্ত, তব ব্যাপ্ত মহিমায়
এ চির ক্রন্দন ধারা কেমনে বহিয়া যায়
কাঁদিতেছে একি ক্ষুধা একি তৃষ্ণা অনিবার!
একি ব্যথা গরজিছে শ্রান্তিহীন দুর্নিবার?
কত জন্ম জন্মান্তর
কত যুগ যুগান্তর।
হে আমার অভিশপ্ত! হে বন্ধু আমার!
হে আমার শান্তিহীন অশ্রু পারাবার!
আমি যে তোমার লাগি
এসেছি সকল ত্যাগি,
আমি যে তোমার লাগি আসিব আবার
কত যুগ যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর।

২৯

তোমায় আমায় যোগ ওগো পারাবার!
কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ পরপার

উদারা মুদারা তারা বল কোন্ গ্রামে?
কোন্ মহা শবদের কোন্ নিত্যধামে?
কোন্ সঙ্গীতের কোন্ রাগিণীর প্রাণে?
কোন্ সুরে কোন্ তালে কোন্ মহাগানে?
অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হতে
দুজনে এসেছি যেন দুটি প্রাণস্রোতে!
তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে ;
কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার!
তুমি ভেসে যাও সখা! অনন্তের পানে!—
আমি যে ভাসিছি শুধু তোমারি এ গানে!

৩০

নিদ্রাহীন নিশি মোর ভরি দিলে আজ
সঙ্গীত তরঙ্গে তব, ওগো গীতরাজ!—
অন্ধকার মাঝে আজি কি শব্দ কল্লোল
চোখে মুখে বক্ষে মোর, তরঙ্গ হিল্লোল
সম, পড়িছে ঝাঁপটি! কাঁপিছে পরান,
ঝটিকায় পূর্ণাহুতি পুষ্পের সমান!
সকল সুখের সর্ব বেদনার ভারে,
উদ্দাম সঙ্গীত ঘেরা এই অন্ধকারে!
তোমারে দেখিতে নারি! শুধু পরশিছে
আমার বক্ষের মাঝে কি যে বিপুলতা!
কত শত শব্দহীন সঙ্গীত জাগিছে,
কত শত সঙ্গীতের পূর্ণ নীরবতা!
সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী,
সকল সঙ্গীত মাঝে অগীত কি জানি!

৩১

ছোট ছোট দীপ লয়ে খেলিতেছিলাম,
গুন গুন গাহি গান ঘরের ভিতরে:—
ক্ষুদ্র প্রাণে আনমনে আঁকিতেছিলাম
ছোট ছোট স্বপ্ন ছবি প্রদীপের করে!
তোমারে ভুলিয়াছিনু হে সিন্ধু আমার!—
আপনার স্বপ্নবদ্ধ ক্ষুদ্র খেলাঘরে—

আলস্যে রচিত মোর পুষ্পমালিকায়
তুলিয়া ধরিতেছিনু ক্ষুদ্র দীপ করে!
যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জনে,
অনন্ত রাগিণী ভরা ধ্বনিতে তোমার,
হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জনে,
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার!
ভাঙিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিভিল!
আমারে তোমার বক্ষে ডুবাইয়া দিল!

৩২

এখনো নামেনি সন্ধ্যা, দিনমণি অস্তপ্রায়,
আলো অন্ধকার ঝরে, তোমার সকল গায়!
মেঘেরা ভাসিয়া যায়, তোমা পানে চাহি চাহি,
মুগধ বাতাস বহে গুন-গুন গাহি গাহি।
অনিশ্চিত আলোকের অপূর্ব এ অন্ধকার!
আকাশ চাহিয়া আছে অবাক নয়ন তার।
ওগো সিন্ধু! অন্ধ তুমি কোন্ ছায়ালোক জুড়ে
গাহিছ করুণ গীতি দ্বিধায় জড়িত সুরে?
কোন্ প্রশ্ন উঠিয়াছে পাওনি উত্তর তার?
হৃদয় ভরিয়া আছে কোন্ সমস্যার ভার?
জীবন-মরণ সাথে কি কথা কহিছ আজি?
কোন্ তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে, কি ব্যথা উঠিছে বাজি?
তোমার পরান হতে আমার পরান 'পরে
সকল আলোক আর সকল আঁধার ঝরে।
পরান কাঁপিছে এই ছায়ালোকে ছায়াময়,—
একি সত্য? একি মিথ্যা? একি আশা?
একি ভয়?

৩৩

আজিতে সঙ্গীত তব কোথা ভেসে যায়?
ধূসর তরঙ্গ মাঝে নীরব সন্ধ্যায়!
কোন্ দূরে অন্ধকারে কোথা উঠে বাজি?
আমার পরান লয়ে কি করিছে আজি!
আরতির শঙ্খ যেন উঠিল বাজিয়া
তোমার পূজার লাগি ধূপধুনা দিয়া
পুণ্য ধূমে সুপবিত্র হৃদয় মন্দির!—
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর!

হে পূজারি! আজি তুমি কোন্ পূজা কর?
পরান প্রদীপ মোর ঊর্ধ্বে তুলি ধর,
কার পানে, কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ?
কোন্ পূজা লাগি বল এত আয়োজন?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু? মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভরে!

৩৪

ওই যে এসেছে সন্ধ্যা! পূরবী রাগিণী বাজে,
হে সাগর! তোমার এ প্রশান্ত বুকের মাঝে!
হৃদয় উদাস করা গভীর ঝঙ্কারে তার
প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছে নীরব সঙ্গীত ধার।
মুখর তরঙ্গগুলি শান্ত হয়ে আসিতেছে
চঞ্চল বাতাসদল থির হয়ে থেমে গেছে!
গগন আলোকহীন, শশী তারা কিছু নাই,
যেন কোন্ মহাশূন্য ঘিরেছে সকল ঠাঁই!
আজি কি মরমে তব, নাহি বাসনার লেশ?--
হয়েছে সকল প্রেম—সকল কর্মের শেষ?
মায়াহীন ছায়া ভরা ধূসর এ অন্ধকারে,
আপনার মাঝে তাই ডুবাইছ আপনারে।
আমিও আপনা মাঝে আপনা লুকায়ে রাখি!—
যবে যোগ ভেঙে যাবে আমারে তুলিয়ো ডাকি!

৩৫

শব্দহীন মহাকাশ, শান্তিভরা সমুদায়,
আজি বরষিছে সন্ধ্যা তোমার সকল গায়
মহাশান্তি নীরবতা! হে সাগর! হে অপার!
বাক্যহীন আজ তুমি শুদ্ধ শান্তি পারাবার।
নীরব সঙ্গীত তব শান্তিভরা অন্ধকারে
আনন্দে উজলি রাখে মর্ম মাঝে আপনারে!
সে আনন্দে বিরাজিছে তোমার সকল দেহ!—
মগ্ন হয়ে গেছে তায় সকল বিষাদ গেহ।
সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হয়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে।
আমার বক্ষের 'পরে যোগাসনে যোগীবর।
নিবিড় নিশ্বাস হীন ধীর স্থির আঁখিকর,

পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার।

৩৬

সাধন ভজনে আজি কুসুম উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভরে। তোমার নয়ন-দুটি
ভক্তিরসে ঢুলু-ঢুলু। বিগলিত করুণায়
তোমার তরঙ্গদল নেচে নেচে বহে যায়।
গগন ভরিয়া গেছে সঘন গম্ভীর বোলে,
চরাচর ছেয়ে আছে মধুর কীর্তন রোলে।
হরিবোল! হরিবোল! করতাল বাজে যেন,
হৃদয়ে বাজেনি কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন!
মুক্তবায়ু প্রভাতের আনন্দ কীর্তন ভারে,
নাচিছে পাগল হয়ে অন্তরের চারিধারে।
দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি। কি মধু বিরহ দিয়া।
প্রাণারাম! প্রাণারাম! তোমা পাই কি না পাই
আমি ভেসে ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই!
হে সাধক, হে ভকত, করহ কীর্তন নব!
সঙ্গে রেখ চিরকাল, সাধন ভজনে তব!

৩৭

এপারে আলোক ভরা ওপারে আঁধার!
পার করে দাও মোরে ওগো পারাবার!
হেথায় তোমার মাঝে
কি জানি কি বাজে!—
তোমার গানের মাঝে, আলো কি আঁধার!
(আমি) দেখিব ওপারে গিয়ে
শুনিব পরান দিয়ে!—
তোমার গানের মাঝে আলো কি আঁধার!
এ পারের গীতগুলি
পরানে লয়েছি তুলি,
মালিকা গাঁথিব তায় ওপারে তোমার,—
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপার!

৩৮

ওপারে কি আলো জ্বলে রহস্যের মতো,—
যে আলো দেখেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায়?
ওপারে কি গীতধ্বনি জাগে অবিরত,—
যে গান শুনেনি কেহ দিবসে নিশায়?
ওপারে কি বসে কেহ তৃষ্ণার্ত আকুল,
পরান-পরশ তরে আমারি মতন?
ওপারে কি দেখা যায়, অনন্ত অতুল,
তোমার অন্তর ছায়া পরান স্বপন?
আমি যে তৃষ্ণার্ত বড়, ওগো মহাপ্রাণ!
আমি যে তৃষ্ণার্ত অতি পরান মাঝারে!
আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ।
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ওপারে,
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন?
কাঙাল পরান হবে রাজার মতন?

৩৯

এপার ওপার করি পারি না তো আর,
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমাব।
পরান ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই!—
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই!
আজি যে ঘিরেছে মোরে গাঢ় অন্ধকার!
সাড়া শব্দ নাহি পাই পরান মাঝার!
নীরব ক্রন্দনে ভরা চোখে নাহি জল,
আজি যে তোমার তরে পরান পাগল!
খুঁজেছি তোমারে কত তরঙ্গের মাঝে,
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে।
তোমাব অপূর্ব ওই আলো অন্ধকারে,
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে!
হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!

অন্তর্যামী

১৯১৪

অন্তর্য্যামী

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

অন্তর্যামী (১৯১৮)-এর আখ্যাপত্র

(১)

কেমনে লাগিয়া গেছ, মন-তটে
কেমনে জড়ায়ে গেছ, আঁখি-পটে!
সকল দরশ মাঝে
তুমি উঠ ভেসে,
সকল পরশমাঝে
তুমি উঠ হেসে!
সকল গণনা মাঝে
তোমারেই গুনি!
সকল গানের মাঝে
তব গান শুনি!
ওগো তুমি মালাকর
মন-মালিকার!
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি
সব সাধনার!
কেমনে জ্বালিলে দীপ, আঁখি-আগে
নিরখি নিরখি মোর, প্রাণ জাগে!

(২)

যখনি দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে!
কোথা হতে জ্বলে দীপ, সম্মুখে তাহার?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার!

যখনি হৃদয়-যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধার।
কোথা হতে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর?
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর!

(৩)

ঘুরিতে-ঘুরিতে আজ জীবনের অন্ধকারে
সম্মুখে সকলি বন্ধ, দুই পথ দুই ধারে!

কোন্ পথে যাব আজ ভেবে ভেবে নাহি পাই।
কে দেখাবে আলো মোরে? কেহ নাই! কেহ নাই!
কিছু নাই কিছু নাই পরানের চারিপাশে!
আঁধাব নয়নে আরো আঁধার ঘনায়ে আসে।

হে মোর বিজন বঁধু, হে আমার অন্তর্যামী!
কতদিন কতবার আভাস পেয়েছি আমি!
আজ কি বঞ্চিত হব, ফেলে যাবে একেবারে?
এ মহা বিজন রাতে এই ঘোর অন্ধকারে?
হা হা! হা হা! করি উঠে পরিচিত হাস্যরব।
কোথা তুমি কোথা তুমি এ যে অন্ধকার সব!
যেখানেই থাক নাথ! আছ তুমি আছ তুমি!
সকল পরান মোর তোমার চরণ ভূমি
ভাবনা ছাড়িনু তবে ; এই দাঁড়াইনু আমি।
যে পথে লইতে চাও লযে যাও অন্তর্যামী!

(৪)

যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই ;
মনে বেখ আমি শুধু, তোমারেই চাই!
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিবিনু যবে,
তোমাব মোহন ওই বাঁশবির রবে,
সেদিন হইতে বঁধু!—আলোকে আঁধারে
ফিরে ফিবে চাহিয়াছি পরানেব পাবে।
তোমারে পেয়েছি কি গো? তা তো মনে নাই!
সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই!
শৈশবে পথের ধারে কবিযাছি হেলা ,
সে কি শুধু অকারণ আপনার খেলা?
সে দিন তোমাবে বঁধু! পাবিনি ধবিতে!—
আমার খেলার মাঝে মোবে খেলাইতে!
প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই!
পুষ্পিত ঝঙ্কৃত সেই আলোক আগারে
কেমনে রাখিলে বঁধু! আপনা লুকাই!
সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই!
তুমি জান দুঃখ মাঝে কবেছি সন্ধান

তোমারে তোমারে শুধু ; পাই বা না পাই,
বঁধু হে! তোমারি লাগি আকুল পরান!
বঁধু হে! বঁধু হে! আমি তোমারেই চাই!—
যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই!

(৫)

এ পথেই যাব বঁধু? যাই তবে যাই!
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিবিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব!
গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব,
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব!
দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক!
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডেক!

(৬)

ভরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
তোমারি দেখানো এই বন পথ দিয়া!
কত না সোহাগভরে তুলিতেছি ফুল
কত না গরবে মোর হৃদয় আকুল!
কত না বিচিত্র রাগে পরান কাঁদিছে!
কত না আশার আশে হৃদয় নাচিছে!
কে যেন কহিছে কথা হৃদয় মাঝারে!
কে যেন আঁকিছে আলো নিশীথ আঁধারে!
কে যেন কি জানি মোরে করায়েছে পান,—
বাতাসে পত্রের মতো মর্ম্মরে পরান।
যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরিছি জীবন।
তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু! বুঝিতে পারিনি।

(৭)

কেমন করে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর।
বুকের মাঝে কেমন করে! চোখে বহে লোর!
দিবস নিশি কতই তব কথা শুনি কানে!
প্রাণের মাঝে তোলা-পাড়া মানে অভিমানে।
পরশ তব স্বপন-সম প্রাণে আনে ঘোর
নিশ্বাস তব মুখে লাগে কাঁপে প্রাণ মোর।
তোমার প্রেমে এত জ্বালা, আগে নাহি জানি!
চোখের জলে ভেসে-ভেসে আজি হার মানি।
ছেড়ে দাও তো চলে যাই তুমি থাক পিছে
দরশ যদি নাহি দিলে সোহাগ করা মিছে!

(৮)

ক্ষম অভিমান বঁধু ক্ষম অভিমান
আঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান।
বাহু বাড়াইয়া দিলে কিছু নাহি পাই,
শূন্য মনে ভূমিতলে কাঁদিয়া লুটাই।
বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা ;—
তবে ছেড়ে দিনু আমি! কর গো বচনা
আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও।—
পরানের তারে-তারে আপনি বাজাও।
আমি কাঁদিব না আর, কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে পড়ে রব।

(৯)

কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে,
পরানে কেমন করে, পরানি তা জানে!
রাগ করিও না বঁধু! আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে।
এত করে চাপি বুক তবু হাহাকার
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বার-বার!
সে শুধু তোমারি তরে, তোমা পানে ধায়,—
তোমারে না পেয়ে, মোর বুকে গরজায়।
এই অশ্রু এই ব্যথা এই হাহাকার
(তুমি না লইবে যদি, কারে দিব আর?)

(১০)

মরম আঁধারে বঁধু! প্রদীপ জ্বালাও!
আমার সকল তারে, বাজাও বাজাও:
আপনি বাজাও! আমি কথা নাহি কব!
নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব!

(১১)

কোন্ ছায়ালোক হতে প্রাণের আড়ালে,
এমন সোহাগ ভরে প্রদীপ জ্বালালে!
ওগো ছায়ারূপী! কোন্ ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি, হৃদিতন্ত্রী চুমি
মোহন পবশে? আমি কথা নাহি কই!
বঁধু হে! নয়ন মুদে শুধু চেয়ে রই।

(১২)

কোথা ওই ছায়ালোক কোথা প্রাণখানি!
এই প্রাণ প্রান্ত হতে কত দূর জানি!
কত দূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই!—
আঁধারের মাঝে শুধু আঁখি মুদে চাই!
একি মোর মরমের অজানিত দেশ?
এই প্রাণ-প্রান্ত কি গো পরানের শেষ?
এ কি গো তোমার বঁধু! গোপন আবাস?
হোথা হতে মাঝে-মাঝে দিতেছ আভাস?
আমি তো জানি না কিছু, তুমি সব জান!–
কোথা হতে এত করে মোরে তুমি টান?

(১৩)

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!
অপূর্ব আলোক ভরা অন্ধকারে ঢাকা!
শত লক্ষ চূড়া তার আনন্দ গম্ভীর,
উঠেছে কোথায় যেন স্বপ্নপটে আঁকা!
নাহি বৃক্ষ তবু আছে বৃক্ষেরি মতন
শত-শত পল্লবের আড়াল করিয়া!—
শত লক্ষ পুষ্প লতা অপূর্ব বরণ
পাকে-পাকে উঠিতেছে ঘিরিয়া ঘিরিয়া!

উজ্জ্বল স্বপন ভরা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে অপূর্ব মন্দির!

(১৪)

নাহি মেঘ, তবু যেন ছুটাছুটি করে
অপূর্ব আলোক ছায়া মেঘেরি মতন!
নাহি চন্দ্র! নাহি সূর্য! কি যে স্বপ্ন ভরে
উজলি রেখেছে তারে, সে কোন্ গগন!
নাহি শব্দ, তবু যেন মধুর গম্ভীর
ঝরিতেছে নিরন্তর কার গীত ধার!—
প্রশান্ত আনন্দ ভরা, ধীর অতি ধীর!—
কে যেন বন্দনা করে কোন্ দেবতার!
বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!

(১৫)

ওই ছায়া মন্দিরের কোথা রে দুয়ার!
কোন্ পথে যেতে হবে?
কে বল আমারে কবে?
যেন হেরি মনে মনে বন্ধ চাবিধার!
ওই ছায়া মন্দিরের কোথা রে দুয়ার!

কঠিন পাষাণে যেন বন্ধ চারিধার
প্রবেশের পথ নাই,
যতই যাইতে চাই!
তবু আশা নাহি ছাড়ে অন্তর আমার!
ওই ছায়া মন্দিরের কোথা রে দুয়ার!

(১৬)

যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
আমার অন্তর আত্মা, বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে!
প্রাণ মোর ভরপুর কি কাতর গানে!
কেন হাসিতেছ তুমি নির্মম নিষ্ঠুর?
অজানিত পথ কি গো এতই বন্ধুর?

যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর!
যেমন করেই হউক যেতে হবে মোর!
পথখানি যেথা থাক পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব!

(১৭)

পথ খানি লাগি প্রাণ ইতি-উতি চায়!
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায়!
কোথা পথ কোথা পথ কোন পথ খানি
সে পথ বিহনে যে গো সব মিছা মানি!
এদিকে ওদিকে চাই চকিত পরানে,
পাগলের মতো ধাই পথের সন্ধানে!
এই পথ দেখে ভাবি পেয়েছি পেয়েছি!
এ পথ সে পথ নয়! এ পথে এসেছি!
নিশ্বাস ফেলিয়া বলি, কত দূর জানি,
এই প্রাণ প্রান্ত হতে সেই পথ খানি।

(১৮)

তুমি হাসিতেছ বঁধু! তাই মনে হয়
সেই পথ খানি মোর কাছে অতিশয়!
এদিকে ওদিকে চাই পাগলের মতো
কোথা পথ? কোথা পথ? খুঁজিছি সতত।
তবু পথ নাহি মিলে! দিশাহারা মন,
রূপ রস গন্ধ নাহি—আঁধার বিজন!
সব গীতি থেমে গেছে! ছিন্ন ফুল হার,
সম্মুখে আলোক নাহি, পশ্চাতে আঁধার!
তবু সেই পথ লাগি ঘুরিছি সতত
এই ঘোর মন-বনে পাগলের মতো!

(১৯)

পথের লাগিয়া মন মন-পথ-বাসী!
আমি তো আমাতে নাই, শুধু কাঁদি-হাসি!
গৃহহীন সঙ্গীহীন! স্বপ্নে হেসে উঠি,
না পেয়ে সে পথ পুন স্বপ্ন যায় টুটি!

কে যেন আমার মাঝে পথ খুঁজে মরে,
আকুল নয়নে কার অশ্রু জল ঝরে।
সে যে আমি, সে যে আমি, আমি সে পাগল।
সব ভুলে অন্ধকাবে কাঁদিছি কেবল!
মন মাঝে এক সুরে বাঁশি বাজে ওই!—
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই?

(২০)

সব তার ছিঁড়ে গেছে। এক খানি তাব
প্রাণ মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার।
সব আশা ঘুচে গেছে! একটি আশায
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায।
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বাব বাব।
সব কর্ম্ম শেষে আজ, মন একতাবা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশা হারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথ খানি মোব গয়া-গঙ্গা-কাশী।

(২১)

সে পথের হইতাম ধূলিকণা যদি
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি!
    বুকে বুকে থাকিতাম,
    কভু নাহি ছাড়িতাম!
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি
সে পথেব পথিকেব পদতলে বাজি,
মিশে মিশে হইতাম পদ-রজ-বাজি,
    আঁকডিযা থাকিতাম,
    মিশে মিশে হইতাম,
ধূলায় ধূসব তার পদ-রজ-রাজি!

(২২)

ধূলায ধূসর তার চরণ তলায়
ধূলা হয়ে থাকিতাম দিবস নিশায়!
    কিছুতে না ছাড়িতাম,

জেগে লেগে রহিতাম,
সেই পথ পথিকের চরণ তলায়!

একদিন অকস্মাৎ কম্পিত পবানে
তারি পায় উঠিতাম মন্দির সোপানে!
কি গান যে গাহিতাম,
হাসিতাম, কাঁদিতাম,
চরণের ধুলা হয়ে মন্দির সোপানে!

(২৩)

কি আর কহিব বঁধু! আমি যে পাগল!
কি যে কহি কি যে গাহি আবোল-তাবোল!
আমি মত্ত দিশাহারা,
দীন কাঙালেব পাবা।—
একটি আশার আশে পথেব পাগল।

নয়ন দরশহীন হৃদয় বিকল
সব অঙ্গ জরজর শিথিল বিফল!
ফিরে ফিরে গৃহে আসি
শুধু অশ্রুজলে ভাসি!
বুকে টেনে লও ওগো! পরান পাগল!
পাগলেরে আর তুমি, কোরো না পাগল!

(২৪)

একি? একি? ওই বুঝি, সেই পথ ভূমি?
মন মাঝে ঢেকে ঢেকে বেখেছিলে তুমি!
তুমিই দেখালে পুনঃ! ওগো গুণ-মণি।
কত গুণের বঁধু তুমি কেমনে তা ভনি!
কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে কথা নাহি মিলে!
কেমনে বুঝাব বঁধু! তুমি না বুঝিলে!
সব সুখ একেবারে ফুটিবারে চায়!
সব দুঃখ গীত হয়ে পরানে মিলায়!
সব আশা সব ভাষা এক হয়ে যায়!
একটি ফুলের মতো চরণে লুটায়!

(২৫)

লও সে অঞ্জলি লও পবান বঁধু হে'
প্রাণাবাম' প্রাণাবাম' প্রাণবল্লভ হে'
    দবশ তুমি নাহি দিলে,
    পবশ তুমি দিযো হে—
চোখে চোখে বেখ সদা পবান বঁধু হে'

(২৬)

শুভলগ্নে আজ তবে, যাত্রা কবিলাম'
মনো পথেব পথিক হযে, পথে ভাসিলাম।
    আঁধাব পথ আলো কবে
    দিযো তুমি সোহাগ ভবে
পবান ভবে পবশ দিযো, পবান বধু হে'—
প্রাণাবাম' প্রাণাবাম' প্রাণবল্লভ হে'

(২৭)

বাজা বে বাজা বে তবে' বাজা জযডঙ্কা'
নাহি লাজ নাহি ভয, নাহি কোন শঙ্কা,
পবান খানি কাঁপছে কত জযমাল্য গলে,
ফুলেব মতো কি জানি গো ফুটছে হৃদিতলে'
সুখেব মতো দুঃখ আজ, দুখেব মতো সুখ'
কোন্ গানেব গববে ওগো ভবিযাছে বুক?
প্রাণেব মাঝে একি শুনি? কি নীবব ভাষা'
বুকেব মাঝে কোন্ পাখি গো বাঁধিযাছে বাসা'
পাযেব তলে বাজে পথ' প্রাণ আজিকে বাজা'
বাজা বে বাজা বে তবে, জযডঙ্কা বাজা'

(২৮)

কি আনন্দে ভবপুব হৃদয আমাব।
বঁধু হে' আজিকে মোব, পথ চলা ভাব'
    পবানবঁধু' বঁধু হে'
    কি আব তোমায কব হে।
আঁখি জলে ভবে হল পথ চলা ভাব'

আমার গলায় দোলা সেই মালা খানি,
এত যে ভারের বোঝা আগে নাহি জানি!
আমার বঁধু বঁধু হে!
কি আর তোমায় কব হে!
ফুলের ভারে ভেঙে পড়ি, পথ চলা ভার!

(২৯)

ওই যে কার গীতধ্বনি জয়ধ্বনি মতো,
হৃদয় খানি ছাপাইয়ে উঠছে অবিরত!
পরান বাঁধা কিসের জালে,
নাচছি যেন কিসের তালে
ভরা পালে তরীর মতো ভাসছি অবিরত!
অনেক দিনের অশ্রু সাধা,
এমন পথে এমন বাধা
পরান আমার কিসের তরে
কি জানি গো কেমন করে!—
হাল হারানো তরীর মতন ভাসছি অবিবত!
আমি আর কি করতে পারি,
আমি যে গো চলতে নারি,
সুর হারানো গানের মতো ভাসছি অবিরত!

(৩০)

তোমার আছে অনেক সুর, একটি সুর দাও!
যে সুরটি হারিয়ে গেছে, তাহারে ফিরাও!
সেই সুরের তালে মানে,
বাঁধ্‌ব আমার প্রাণে-প্রাণে!
অনেক দিনের সাধা সুর, সেই সুরটি দাও।
তোমার আছে অনেক গান, একটি গান গাও!
যে গান আমি ভুলে গেছি, সে গান শুনাও!
দাঁড়িয়ে আছি পথের মাঝে,
সে গান জানি কোথায় বাজে!
অনেক গানের অনেক সুরে, কেন গো জড়াও?
আমি চাই একটি গান, সে গানটি গাও!

(৩১)

তুমি গাও একবার! আমি গাই পুনঃ।
তোমার গান আমার মুখে কেমন শুনায় শুন!
তোমার গান তোমার রবে, আমি শুধু গাব!
তোমার কথায় তোমার সুরে, পরান জুড়াব!
আমার গান হয়ে গেছে, গাও আরেক বার!
তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি করে, গাও হে আবার!
তুমি যবে গাইবে বঁধু! আমি দিব তাল!
আমি যে ভাসাব তরী তুমি ধর হাল।
দুজনায় এম্‌নি করে পথ চলি যাব।
(এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি করে, সে মন্দির পাব)

(৩২)

তুমি হেসে হেসে বঁধু! কর গোলমাল!
বোধ হয় সবি যেন স্বপনের জাল!
তবে কি বৃথায় আমি, এই পথ বাহি?
এ পথের শেষে কিগো সে মন্দির নাহি?
তবে কি বৃথাই মোর চিত্ত ছুটে যায়
ওপারের ছায়াময় মন্দিরের গায়?
এত অশ্রু এত ব্যথা নাহি ব্যর্থ হবে!—
সত্য পথ বাহিতেছি তব বংশী রবে।
তুমি জান তুমি জান, ওগো মন-বাসী!
তুমি তো ভাসালে মোরে তাই আমি ভাসি।

(৩৩)

এবার তবে চলিলাম সুরটি ক'রে বুকে
সকল জ্বালায় বাজিয়ে দেব সকল সুখে-দুখে
এই তো আমার পোষা পাখি, রবে বুকে জড়িয়ে!
ঘুমিয়ে যদি পড়ে সে গো! চুমি দিব জাগিয়ে!
আঁধার যদি আসে আরো, নেব তারে টানিয়ে
প্রাণের মাঝে রাখব তারে, প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়ে!
তোমার গান আমার গান এক হয়ে যাবে!—
পথের মাঝে তরুলতা, সেই গানটি গাবে!
তবে তুমি থাকবে কাছে কাছে!
থাকবে তুমি বুকের মাঝে, থাকবে পাছে পাছে!

(৩৪)

পথের মাঝে এত কাঁটা! আগে নাহি জানি!
কাঁটা বনের ভিতর দিয়া গেছে পথখানি!
    কাঁটায় কাঁটায় ফালা-ফালা,
    কাঁটার ডাল কাঁটার পালা,
কাঁটার জ্বালা বুকে করে, গেছে পথ খানি!

কাঁটার ঘায় জ্বলে জ্বলে চল্‌ছি পথ বাহি!
    বেড়া আগুনের মতো
    জ্বলছে প্রাণে অবিরত!—
সে জ্বালায় জ্বলে জ্বলে এই পথ বাহি!
তোমার গাওয়া প্রাণের গান,—সেই গান গাহি!

(৩৫)

তোমার পথে এত কাঁটা! আগে নাহি জানি!
আপন হাতে যাহা দাও, তাই ভালো মানি!
একটু খানি সোহাগ দিয়ো, দিয়ো জ্বালাতন!
একটু খানি পরশ দিয়ো, হোক্ না কাঁটাবন!
একটু খানি আলোক দিয়ো আঁধার বনমাঝে!
একটু খানি বুকে টেনো যখন ব্যথা বাজে!
একটু খানি ধরিয়ে দিয়ো, তোমার গানের সুর
সব-জুড়ান্ সুধা-স্রোতে, ভর্‌ব প্রাণ পুর!
কাঁটার জ্বালা ভুলে যা'ব, চল্‌ব গান গাহি!—
পথের শেষে দিয়ো বঁধু! যাহা প্রাণে চাহি!

(৩৬)

কাঁটার জ্বালায় জ্বলে মরি, বঁধু হে আবার!
জ্বালার উপর জ্বালা! আজি প্রাণ অন্ধকার!
জীবনের যত সুখ শেষ হয়ে গেছে,
যত ফুল ফুটে ফুটে ঝরে শুকায়েছে,
যত দীন দুঃখে আমি ভরেছিনু প্রাণ,
যত স্বান্ত আনন্দের গেয়েছিনু গান ;
ছোট খাট সুখে যত উৎসবের রাতি,
ফুলে-ফলে সাজাতাম জ্বালিতাম বাতি,
লুকায়ে আছিল সব কি জানি কোথায়!
প্রেতের মতন আজি ঘিরেছে আমায়!

(৩৭)

সে দিনের গানগুলি মনে করেছিনু
গাওয়া হলে সব বুঝি শেষ হয়ে যাবে।
হৃদয় উজাড় করে সকলি ঢালিনু!
কে জানিত তারা পুনঃ হৃদয়ে লুকাবে!
ওই ওই ওই সেই ব্যর্থ ভালোবাসা!—
দীর্ণ হৃদয়ের সেই, প্রমত্ত পিপাসা!
ওই ওই ওই আসে মোর পানে চেয়ে
ভীষণ ভৈরব দল ওই আসে ধেয়ে!
কোথা যাব, কোথা যাব, কোথায় লুকাব?
ভয়ে ভেঙে পড়ে প্রাণ, কেমনে বাঁচাব?

(৩৮)

ক্ষণে ক্ষণে বাঁচে প্রাণ! ক্ষণে-ক্ষণে মরে!
বুকের মাঝে ভূতে প্রেতে কত নৃত্য করে!
পরানের আশে-পাশে, বিভীষিকা যত
আঁখি খুলে আঁখি মুদে হেরি অবিরত,
প্রাণ খানি মোর যেন গ্রাস করিবারে!
আসে সব আসে ধেয়ে ঘোর অন্ধকারে!
চারিদিকে শুনি শুধু, বিকট চিৎকার!
পরশে অন্তরে শুধু মৃত্যুর আঁধার!
ভয়ে ত্রাসে সব অঙ্গ কাঁপে থরথর!
কাঁপিতেছে সর্বপ্রাণ মৃত্যু জরজর!

(৩৯)

এস আমার আঁধার ঘেরা! এস ভয়হারী
এস এস হৃদ্‌মাঝারে, হৃদয়বিহারী!
এস আমার আঁধার বুকে, এস আলো করে!
এস আমার দুখের মাঝে সকল দুখ হরে!
এস আমার সকল প্রাণে ওগো প্রাণহরা!
এস আমার সকল অঙ্গে ওগো সোহাগ ভরা!
এস আমার প্রাণের মালা! এস মালাকর!
এস এই ঝড়ের মাঝে! এস বুকের 'পর!
এস আমার মরণ কালে এস হাসি হাসি!
এস আমার মরণ-হরা সব-ভুলানো বাঁশি!

(৪০)

এস আমার মন-বাসে টিপি টিপি পাও!
চরণ তলে প্রাণে প্রাণে কুসুম ফুটাও!
তেমনি করে আবেগ ভরে পিছনে দাঁড়াও!
তেমনি করে হাত দু-খানি নয়নে বুলাও!
তেমনি করে মুখে চোখে পড়ুক নিশ্বাস।
তেমনি করে দিয়ে যাও চুম্বন আভাস!
তেমনি করে গোপন কথা কও কানে-কানে!
তেমনি করে গানের মতো বাজ প্রাণে-প্রাণে!
তেমনি করে কাঁদি আর তেমনি করে হাসি!
তেমনি করে ডুবি আর তেমনি করে ভাসি!

(৪১)

এস মন-বন-বাসে! এস বনমালী!
চরণ তলে ফোটা ফুল, তারি বরণ ডালি
সাজায়ে রেখেছি আজ নয়ন-জলে ধুয়ে!
পরান ভরে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে!

তোমার পায়ে ফোটা ফুল কাঁটা নাহি তায়।
কত না আনন্দে মোর হৃদয়ে লুটায়!
এস মন-ব্রজ-বাসে! এস বনমালী
তোমার ফুলে সাজায়েছি, তোমার বরণ-ডালি!

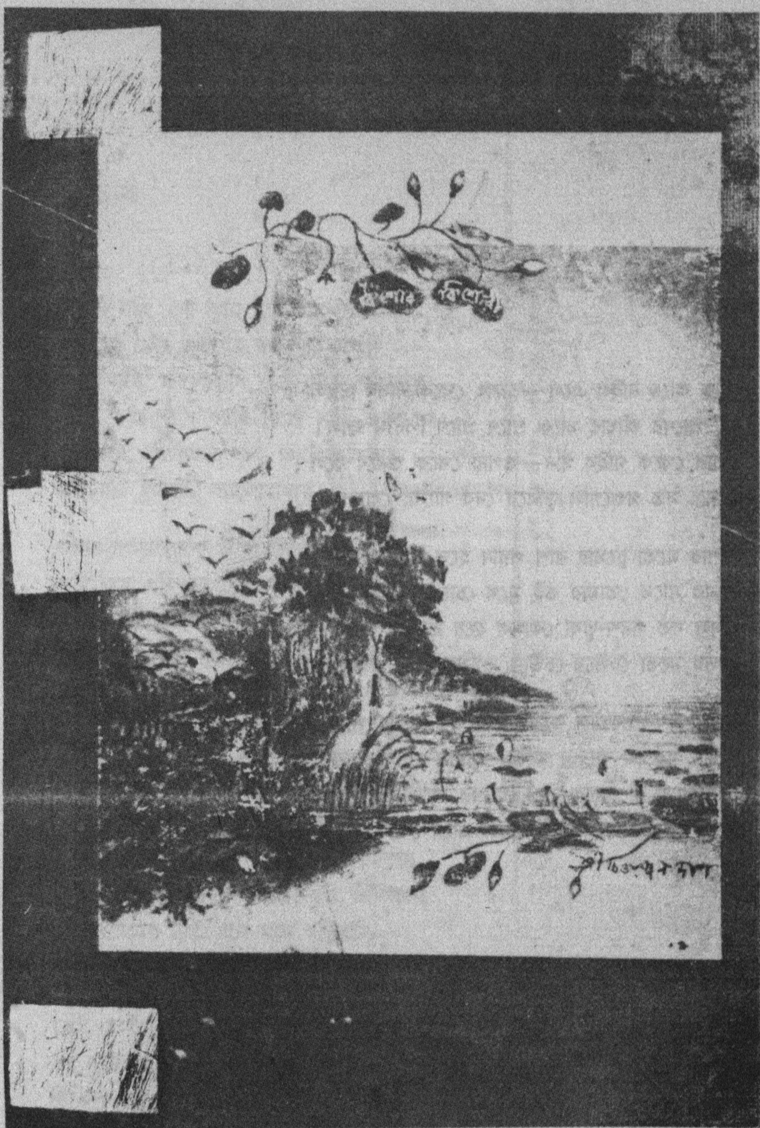
(৪২)

এস আমার প্রাণের বঁধু! এস করুণ আঁখি!
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা, তোমায় কোথা রাখি।
প্রাণের এত কাছাকাছি আছ তুমি চেয়ে!
তোমার ওই চোখের ছায়া আছে প্রাণ ছেয়ে!
একটুখানি দাঁড়াও তবে, কাঁটা তুলি দিব!
তোমার তরে কোমল করে প্রাণ বিছাইব।
এস আমার কোমল প্রাণ! এস করুণ আঁখি।
কাঁটা তোলা প্রাণের মাঝে আজ তোমারে রাখি!

এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশি!
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশি!

ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে, চিরদিনের তরে!
নাইকো আর আঁধার কোন, আমার আঁখির 'পরে!
প্রাণের মাঝে আঁকে-বাঁকে বিভীষিকা যত
পালিয়ে গেছে তারা সব চিরদিনের মতো!
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ!
মনের মাঝে সাড়া দিয়ো ডাকিব যখন!

কিশোর-কিশোরী
১৯১৪



কিশোর-কিশোরী (১৯১৪)-এর প্রচ্ছদ

কাছে কাছে নাইবা এলে—তফাৎ থেকে বাসব ভালো ;
দুটি প্রাণের আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম জ্বাল।
এপার থেকে গাইব গান—ওপার থেকে শুনবে বলে ;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে!

আশার মতো চুমোর রাশ পরান হতে উড়াইব ;
গানের সাথে তোমার ওই মুখে চোখে বুলাইব।
পাগল যত পরশ-তৃষা কোমল হয়ে ভাসবে গানে ;
ফুলের মতো ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেব তোমার পানে।

লাগবে যখন কোমল করে তরুণ তব প্রাণের পারে ;—
আশার মতো—ফুলের মতো—পরান ঘেরা অন্ধকারে,
ভয় পেয়ো না চম্‌কে উঠে, প্রাণের মাঝে চেয়ে থেকো ;—
ভেসে আসা প্রাণের নিধি প্রাণের-প্রাণে বেঁধে রেখো।

আভাষ

(১)

সেদিন নাহি গো আর যবে ভালোবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালোবাসারে!
ভালোবাসি, ভালোবাসি, মনে মনে কহিতাম!
কারে ভালোবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম!
হাসিতাম, কাঁদিতাম, শুধু ভালোবাসিতাম
আপনারি হৃদয়ের ভালোবাসায়!

কল্পনা-গগনালোকে উড়ে উড়ে ভাসিতাম,
সত্য বলে ধরিতাম সেই কল্পনারে—
মেঘের আড়ালে মোর মায়ানীড় বাঁধিতাম,
স্বপন মন্থন করা ফুলে ফুলে সাজাতাম,
কত দীপ জ্বালিতাম, কত গীত গাহিতাম,—
মেঘের আড়ালে মোর সেই মায়া আগারে।

কেহ ভালোবাসে নাই। তবু ভালোবাসিতাম,
শুধু মোর হৃদয়ের ভালোবাসারে!
ভালোবাসা, ভলোবাসা, বলে শুধু কাঁদিতাম,
কারে কহে ভালোবাসা তাও নাহি জানিতাম,
মধুর প্রেমের মূর্তি মনে মনে গড়িতাম—
পূজিতাম দেহহীন সেই দেবতারে!

সেই প্রেম নিরাকার কতদিন থাকে আর?
সব শূন্য হয়ে গেল জীবন-ভাণ্ডারে!—
নিভিল সে দীপাবলী, ছিঁড়িল সে ফুলহার,
নির্জন পরান ভরে উঠিল রে হাহাকার!—
সে দিন বাহিয়া গেল, যবে ভালোবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালোবাসারে!

(২)

সেই সে প্রথম দেখা, সাঁঝের আঁধারে!
ধূসর গগন-তলে
নব-শ্যাম-দূর্বাদলে,
ক্লান্তদেহে ছুটে গেনু তোমা দেখিবারে!
সেই সে প্রথমবার দেখিনু তোমারে!
অধরে অমল হাস,
আঁখি-কোণে লাজ-ভাস,
কে ডাকিল? ছুটে গেনু সাঁঝের আঁধারে!

সে কোন্ কুসুম-সম,
ফুটিলে মরমে মম,
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে!
বর্ণে বর্ণে উজলিলে,
গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে,
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয়-ভাণ্ডারে!
ওগো ফুল! ওগো মিষ্ট!
আমি ক্লান্ত, আমি ক্লিষ্ট!
কার ডাকে ছুটে এনু?—দেখিনু তোমারে
সেই সে প্রথম বার সাঁঝের আঁধারে।

(৩)

কে দেখিল সেই দিন সন্ধ্যাকাশ তলে,
সে কোন্ দেবতা?
কে শুনিল কান পাতি শ্যাম-দূর্বাদলে
কাহার বারতা?—
তুমি দেখেছিলে কিছু?—আমি দেখি নাই।
তুমি শুনেছিলে কিছু?—আমি শুনি নাই!

কে দেখিল বল বল, কারে দেখাইলে,
কে চাহিল, কার লাগি বহিয়া আনিলে,
সেই শ্যাম-দূর্বাদলে নীরব-গৌরবে,
আনন্দ মুরতি?
ধ্বনিয়া উঠিল কিগো মেঘমন্দ্র রবে
সন্ধ্যার আরতি?

আমি জানি নাই কিছু,—তুমি জান নাই,
বুঝিতে পারিনি আমি, তুমি বুঝ নাই—

তবে কার ডাকে তুমি চলে এসেছিলে ;
না জেনে না শুনে কেন আমারে ডাকিলে
কোন্ মহা-পরানের নীরব-নির্জনে,
বল কোন্ কাজে?

জীবনের কোন্ কুঞ্জে বিরলে বিজনে,
কার বাঁশি বাজে?
নির্বাক্ নয়নে সেই অন্ধকার তলে,
কোন্ মহিমায়,
শব্দহীন সন্ধ্যা,—সেই শ্যাম-দূর্বাদলে—
কোন্ গীতি গায়?

তুমি কি অবাক্ হয়ে শুনেছিলে তাই?
আমি তো শুনিনি কিছু,—কিছু বুঝি নাই!
তুমি কি আভাস পেলে পূজার গানের?
গন্ধ পেয়েছিলে বুঝি পূজার ধূমের?
তাই ছুটাছুটি করে, চলে এসেছিলে
আকুল সন্ধ্যায়,

সেই সে প্রথম দিন!—আমারে দেখিলে,
দেখাল আমায়,—
আনন্দ মুরতি তব! কাহার লাগিয়া?
বল তব হৃদি-পদ্ম আছিল জাগিয়া?
কে চাহি পূজার ডালি, সাজাইছে কেবা,—
কাহার পূজার লাগি,—কে করিছে সেবা!

(৪)

আমি কেন ছুটে এনু? জানি না আপনি,
যখনি দেখিনু তোমা, আসিনু তখনি!
কোন ডাক শুনি নাই, তবু কে ডাকিল,
কে যেন ঘুমাতেছিল—সে যেন জাগিল!
আমি ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই,
কোন ডাক শুনি নাই কেমনে বুঝাই,—
কেন যে আসিনু ছুটে?—তুমি কি বোঝ না,
এ নহে কথার কথা,—এ নহে ছলনা?

তুমি কি ভেবেছ মনে ঠিক করেছিনু,
আগে হতে?—আমি জেনেশুনে এসেছিনু,

মোহিনী মুরতি তব দেখিবার তরে
কৌতূহল পরবশ বাসনার ভরে?
সামান্য তস্কর-সম চুরি করি নিতে?
সৌন্দর্য-সম্পদে তব মোর দৃষ্টি দিতে?
চাও মোর আঁখি পানে—ও কথা ভেব না,
এ নহে কল্পনা,—ওগো, এ নহে ছলনা।

কিসের কল্পনা বল, কিসের ছলনা?
কেমনে জাগিবে আজি বিহ্বল বাসনা
বিগত যৌবনে? মোর মাঝে নিরন্তর,
হাসিত কাঁদিত সেই যে চির-সুন্দরঃ—
বাসনায় পূর্ণ প্রাণ, বুকে রক্তরাশি,
আপনি উত্তাল হয়ে বাজাইত বাঁশি।
মাথায় ফুলের মালা, ফুলধনু হাতে,
ফুলের তরঙ্গ তুলি বসন্তের রাতে,
আপনি কাঁপিত আর মোরে কাঁপাইত!
আপনি ভাসিত, আর মোরে ভাসাইত!
সে ফুল তরঙ্গে, কোন্ অপারের পারে,
লয়ে যেত ভাসাইয়া মোরে বারে বারে?—
আঘাতি হৃদয় মোর আছাড়িত তীরে!
আবার ভাসায়ে দিত, আসিতাম ফিরে!
জীবন ভরিয়াছিল তারি মহিমায়,
গরবে গৌরবে তারি, সুখে, বেদনায়!

চাহিলে ফুলের পানে, ভাবিতাম ফুল,
এখনি ফুটিবে প্রাণে,—করিবে আকুল,
পরান মুকুল রাশি। ছুটিতাম তাই,—
হৃদয় মাঝারে মোর, যদি তারে পাই।
যদি কভু শুনিতাম, কোন সুন্দরীর
সৌন্দর্যের স্তুতিবাদ,—অমনি অধীর
বাসনার স্রোতে মোরে ভাসাইয়া নিত!—
তাহারি কল্পিত বুকে মোরে পরশিত।

আমি সেই কল্পলোকে মুদিয়া নয়ন,
তাহারি লাবণ্যের কুসুম চয়ন
করিতাম মনে মনে ; মুরতি গড়িয়া,
প্রাণে প্রাণে সাজাতাম পরান ভরিয়া!
কত না সোহাগভরে মালা গাঁথিতাম,

সেই মালা তারি অঙ্গে জুড়ায়ে দিতাম
মনে মনে! ছুটিতাম তারি অভিসারে,
ভাবিতাম, আসিবে সে, ধরিব তাহারেঃ
সে চির-সুন্দর মোর, নাই আর নাই!
বিগত যৌবনে তারে খুঁজিয়া না পাই!
শিথিল হৃদয় আজি, নিষ্প্রভ নয়ন,
বক্ষমাঝে রক্তধারা ছুটে না তেমন,—
উত্তাল উন্মাদ হয়ে! কাঁপে না অন্তরে,
নির্বোধ বাসনাপুঞ্জ, পাতার মর্মরে,
পুষ্পের পরশে! সৌন্দর্যের কথা শুনে,
উন্মত্ত হযনা হৃদি স্বপ্ন-জাল বুনে।

তবু, কেন আনে নাই তোমার বারতা,
আমার কানের কাছে ;—ওগো কোন কথা,
শুনি নাই অপরূপ, তোমার রূপের!
বাজে নাই কোন তন্ত্রী মোর মরমের,
তোমা দেখিবার আগে। তোমার লাগিয়া
ছিল না পরান মোর কাঁপিয়া, চাহিয়া!
সেই যে আসিলে সেই যে প্রথমবার,
ধূসর গগন তলে,—সাঁঝের মাঝার!—

তার আগে কেহ মোরে কহে নাই নাম,
কোন্ ঘর আলো কর,— কোথা তব ধাম!
ওই যে অধর তব সরলতা মাখা,
সকল মাধুরী তার হাসি দিয়ে ঢাকা,
সুখসূর্য-কর-স্নাত কুসুম সমান ;
করুণায় ভরাভরা ওই যে নয়ান!—
তার কথা শুনি নাই ;—ওগো মর্ম-লতা
আপনি আনিলে তুমি আপন বারতা।

তবে কেন ছুটে গেনু দেখিতে তোমারে?
আপনি বুঝিতে নারি, নারি বুঝাবারে।
শুধু মোর মনে হয়, কে যেন ডাকিল,
তোমার সম্মুখে আনি জাগাইয়া দিল!
জ্বলন্ত প্রদীপ হতে যেমন জ্বালায়,
আর একটি প্রদীপ আনি তাহারি শিখায়,
তেমনি আমারে লয়ে ধরিল যখনি,
তব রূপ-শিখা 'পরে জ্বলিনু তখনি!

কণ্ঠে মোর জড়াইনু গৌরবের মালা,
কাঁপিতে কাঁপিতে ; এই যে প্রদীপ জ্বালা,
সর্ব প্রাণে, সর্ব মনে, ওগো সব অঙ্গে,
ভাসিছি ডুবিছি তারি আলোক-তরঙ্গে।
এ আলো কাহার তরে?—কেবা জ্বালাইল?
কার পূজা লাগি বল প্রদীপ জ্বলিল?
কোন্ দেবতার কোন্ মন্দিরেব গায়,
ঝুলে ঝুলে জ্বলিতেছি দিবস নিশায়?

(৫)

কেন হাস? মিথ্যা একি? অলীক ঘটনা?
আমি কি করেছি শুধু স্বপন রচনা?
তবে কেন চিত্ত মাঝে আজো কেঁপে উঠে?
পরানের কুঞ্জে-কুঞ্জে কেন পুষ্প ফুটে?

এই যে দিবস নিশি মোর চারি পাশে—
হৃদয়ের অন্তস্তলে, আকাশে বাতাসে,
সকল বিশ্বের মাঝে ফুলের সৌরভ!
মিথ্যা এ আনন্দ ভাস? মিথ্যা এ গৌরব?

সকল পরানে মোর সারা দেহময়
এই যে দিবস নিশি কি যে কথা কয়,
কত না জীবন্ত ভাবে কত শত সুরে,
বাজিছে গানের মতো এই প্রাণ পুরে!—

কভু বা গভীর কভু মধুর সরল,
কভু বা কঠিন কভু করুণা তরল!
নিমেষে নিমেষে মোরে হাসায় কাঁদায়
নিমেষে নিমেষে মোরে মরায় বাঁচায়!

এও মিথ্যা! আমি আছি, তাও মিথ্যা তবে?
আমি নাই! তুমি নাই, কিছু নাই ভবে!
মিথ্যা তবে সে দিনের ধূসর গগন,
তুমি মায়া, আমি মায়া! মোদের মিলন

মিথ্যা সে মায়ার খেলা। সেই মধু হাসি?
সেই যে অধরে তব উঠেছিল ভাসি?
তাও ভুল? তাও স্বপ্ন? তাও মিথ্যা তবে?
চোখের চাহনি সেই? তাও মিথ্যা হবে!

সেই যে কি জানি কেন বক্ষের দোলনি!
অবাক বিভোর সেই চক্ষের চাহনি!
যেন কোন্ দূরাগত সঙ্গীতের বাণী
সচকিত করেছিল সব দেহখানি!

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ মুরতি!
সকল চাঞ্চল্যভরা, অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে,—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে-পঞ্জরে!

এও তবে মিথ্যা কথা! শুধু স্বপ্ন বুঝি?
আমি তো হেরেছি সদা দুটি চক্ষু বুজি।
হারাইয়া যায় বলে বক্ষে চেপে রাখি!
আমি যে হেরেছি সদা—তাও মিথ্যা নাকি?

তবে মিথ্যা, মিথ্যা সেই আনন্দের ত্রাস,
আমি মিথ্যা, মিথ্যা সেই মায়া সন্ধ্যাকাশ!
মিথ্যা সেই মধুভরা শ্যাম-দূর্বাদল
মিথ্যা সেই প্রাণভরা আঁখি ছলছল!

মিথ্যা সেই সত্য-রূপী মুরতি তোমার,
আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, সবি মিথ্যাকার!
জগৎ-সংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা!
বল কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা?

মিথ্যা সেই কোমলতা করুণা-রূপিণী!
বুঝি বা চোখের দোষে দেখিতে পারিনি
ভালো করে স্বপ্নালোকে, সেই সে তোমারে,
মায়া-মন্ত্রালোক-ঘেরা, সন্ধ্যার আঁধারে!

কে দিল নয়নে মায়া-অঞ্জন বুলায়ে?
সকল অন্তর মোর কে দিল ভুলায়ে?
ওগো আমি কারে বলি কারে হেরিলাম,
নয়ন পুত্তলি মম—আঁখি অভিরাম!

তবে কি হেরেছি যাহা তুমি তাহা নহ?
ওগো মায়া! ওগো মিথ্যা! সত্য করে কহ।
কোন্ দানবের সৃষ্টি দেবীর আকারে
দেখা দিলে সেই দিন মোরে ছলিবারে?

তবে কোন্ ছদ্মবেশী রূপসী-রাক্ষসী
আমার এ অন্তরের অন্তঃপুরে বসি
যত না মাধুরী ছিল, ছিল যত প্রাণ,
একই নিশ্বাসে সব করেছিল পান,

চিরস্মরণীয় সেই সন্ধ্যাকাশতলে?
আনন্দ-আবেশ-ভরে নয়নের জলে
আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ ;—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ!

অজো হেরিতেছি তাই সেই সে তোমারে
দিবালোক-মহিমায় নিশীথ আঁধারে!
সকল জীবন ভরি প্রত্যেক নিমেষে,
সকল কর্মের মাঝে সব কর্ম শেষে!

সেই সেই তরঙ্গিত পরান মুরতি
সকল চাঞ্চল্যভরা অচঞ্চল গতি!—
সকল লাবণ্য-গড়া রূপে ঢলঢল,
পরান তরঙ্গে সেই স্থির শতদল!

সঘন গগনে থির চপলার মতো
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিবত!
সকল করম মাঝে সব কামনায়,
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায়!—

সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায,
সকল সুখেব মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায,—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায়!

মিলনের মন্ত্রপড়া সেই সন্ধ্যাতলে
সেই মধু জ্বল-জ্বল শ্যাম-দূর্বাদলে,
অবাক নয়নে তুমি দাঁড়ালে যখন
অন্তহীন মহিমায়! সেই সে তখন—

অনিত্য কালের মাঝে একটি নিমেষ,
চমকি থমকি যেন আনন্দে অশেষ
ফুটিল গৌরবভরে চির-নিত্য হয়ে ;
ঘিরি তারে কালস্রোত যেতেছিল বয়ে!

অফুরন্ত চির-সত্য অনন্ত অশেষ
অনিত্য কালের মাঝে সেই সে নিমেষ!
চিরদিন জাগিবে সে আপন গৌরবে!
তুমি আমি যতদিন ততদিন রবে!

সেই সে নিমেষ মাঝে তুমি দেখা দিলে
তুমি কিগো চিরকাল তারি মাঝে ছিলে?
কোন্ মহাপ্রাণের বাঁশরি শুনিলে
আপনার আবরণ খুলে ফেলে দিলে।

সেই যে মুহূর্ত মোর, তুমি মূর্তি তার।
নহ মিথ্যা! সত্য তুমি! সত্য রূপাধার।
সত্যই সে দিন আমি নয়নে হেরেছি,—
সত্যই পরান ভরে পরানে তুলেছি!

অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপরস-গন্ধভরা আত্মার মন্দির।
পদতলে কলকলে কাল ঊর্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা।

এই যে প্রত্যক্ষ মোর প্রাণ মাঝে জাগে
তোমারে বুঝাতে নারি তাই ব্যথা লাগে
কেমনে বুঝাতে তোমা ; ওগো বক্ষবাসি,
আমি সে মুরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।

মনে হয় চিরকাল ভেসে ভেসে যাই
কত জনমের সাধ বুকে লয়ে তাই
সেই সে মুরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।
এখনো সন্দেহ তব? ফের্ ওই হাসি?

আরে আরে অবিশ্বাসি! আরে রে নির্দয়!
ওই তব বক্ষতলে নাহি কি হৃদয়?
সেদিন কি প্রাণে তোর ডাকে নাই বান?
ফুলে ফুলে উঠে নাই সকল পরান?

ভেসে বহে যায় নাই সকল মরম,
ডুবাইয়া সব কর্ম, সকল ধরম,
ওই কোথাকার সুধা সাগরের পানে,—
পেতে পেতে নাহি পাওয়া কাহার সন্ধানে?

আমার পরান ভরে কি গীত গুঞ্জরে!
মরমের প্রতি পত্রে কি ফুল মুঞ্জরে!
বুঝতে পারি না তোরে তাই কাঁদে প্রাণ,
পরান ছাপায়ে তাই ভাসে দু-নয়ান!

ওগো মর্ম্মলতা! মরমে জড়ায়ে থাক!
আমার বক্ষের মাঝে রাখ মুখ রাখ!
তবে যদি নীরবে গো পারি বুঝাইতে
আজো যাহা পাই নাই হেরিতে শুনিতে।

রাখ বুকে বুক। কর গো হৃদয়ঙ্গম!—
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর-সঙ্গম
পানে বহি চলিয়াছে, দিবসরজনী,
কার পিছে পিছে, শুনি কার শঙ্খধবনি!

বুঝিতে পার না কিছু? থাক তবু থাক
আমার বক্ষের মাঝে লতাইয়া থাক!
তোমারে হৃদয়ে রাখি মোর মনে হয়
কে যেন আমার মাঝে সদা কথা কয়!

কে যেন ডাকিছে কত মধুর মন্তরে
আমাদের দুজনের অন্তরে-অন্তরে।
কে যেন গো এসে এসে ফিরে চলে যায়,
হেসে হেসে জীবনের বিজন তলায়!

ওগো মর্ম্মলতা! থাক তবু থাক
আমার মর্ম্মের মাঝে জড়াইয়া থাক!
তুমিও শুনিবে প্রাণ! আমি যদি শুনি!
সেই তার নুপুরের মধু রুনুরুনী!

তুমিও হেরিবে প্রাণ! আমি হেরি যদি!
চিত্ত-মাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি!
দেখিব দেখাব তোরে মরমে-মরমে
জীবন-মরণ ভরে জনমে জনমে!

(৬)

কেমনে উঠিবে ফুটি শুধু এক দিনে?
আরে! আরে! ফুল যবে হেসে ফুটে উঠে

শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ-সূর্য-করে,
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সেকি শুধু সেই মুহূর্তের
লীলা? তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন-লীলা যুগ-যুগান্তের,
জন্ম জন্মান্তর ধরে? অনন্ত কালের
শুভ সঙ্গীতের মাঝে উঠে সে ফুটিয়া!—
ফুটে না-ফুটে না ফুল শুধু এক দিনে!

সেই যে মিলিনু দোঁহে সন্ধ্যাকাশতলে
সে কি শুধু মুহূর্তের মিলন-উৎসব?
অকস্মাৎ অকারণ সামান্য ঘটনা?
মুহূর্তে আরম্ভ আর মুহূর্তেই শেষ?
সেই যে দরশ তব, আঁখি অনিমেষ,
সে যে মোর শুভ-দৃষ্টি জনমে জনমে
চির পরিচিত! সে যে অনন্ত কালের!—
যোগভ্রষ্ট যোগযুক্ত যুগ যুগান্তের!
তোমারে দেখেছি শুভে! কত শত বার!
আবার দেখিনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে!

যোগভ্রষ্ট আমি! কেমনে বর্ণিব বল
অনন্ত কালের সেই মাধুর্য-কাহিনী?
যুগে যুগে কেমনে যে পরশ লভেছি!
জনমে জনমে কেন হারায়ে ফেলেছি!
কেনবা পাইনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে।
ফুটিয়া উঠিলে মরি! মধু-জ্বল-জ্বল
উজল রসের মূর্তি। কত না কল্পনা
করিছে, জীবন যেন স্বপন-বাহিনী!
যেন ধরা দেয়, শত শত জনমের
কত না হাসির ধ্বনি কত অশ্রুজল!

জীবন-লীলার সেই প্রথম প্রত্যূষে
মনে হয়, ছিনু মোরা শিলাখণ্ড দুটি—
অগাধ আঁধারে যেন ভেসে ভেসে উঠি
দুইটি উপল খণ্ড সৃষ্টি পারাবারে।
বুকে বুক লাগা, সেই যে প্রথম জাগা
প্রাণদীপ্ত মন্ত্রমুগ্ধ নির্বাক অবাক

দুইটি পরান! কে দিল তুরঙ্গ তুলি?
আবার ডুবিনু কেন আঁধার নির্জনে?—
তরঙ্গসঙ্কুল সেই গভীর অর্ণবে
জীবন-লীলার কোন্ প্রথম প্রত্যুষে?

তারপরে কতকাল কত যুগ ধরে
কালের তিমির-স্রোত বহে চলে যায়
কোন্ চিহ্নহীন পথে? আলোকবিহীন
কোন্ ঘন-তমসায়? কোন্ স্মৃতিহীন,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার অরণ্যের মাঝে
হয়ে যায় লীন! সেই মহাশূন্যে যেন
অট্টহাসে পূর্ণ করি দিক দিগন্তর
নৃত্য করে উন্মত্ত সে কোন্ দিগম্বর!
তারি মধ্যে তামি আমি ছিনু কি নিদ্রায়
কতদিন কতকাল কত যুগ ধরে?

তারপর হেসে উঠে নব-বসুন্ধরা
ফলে পুষ্পে ভরা ভরা! কৌতুকে অপার
চাহিল নয়ন মেলি নব সূর্যপানে।
মোরাও জাগিনু দোঁহে। মধুবন মাঝে
আমি বনস্পতি ওগো। তুমি বনলতা।
কি আনন্দে কি গৌরবে মেলিলাম আঁখি।
আঁকড়িয়া ধরিলাম কঠিন হৃদয়ে,
মধুর কোমল কান্তি সেই লতিকারে!
গলাগলি জড়াজড়ি মিলন রভসে।
হেসে হেসে উঠিল সে নব-বসুন্ধরা।
সেই বার সেই মোর ভ্রমর জনম।
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি বনে বনে!
বুকে লয়ে জন্মান্তের বিরহ-বেদন
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি আনমনে!
অকস্মাৎ একদিন কানন-প্রান্তরে
অপূর্ব কুসুম-রূপে উঠিলে ফুটিয়া!
আনন্দেতে আগুসারি মিলন-তৃষায়
যেমনি আসিনু কাছে, কোন্ ঝটিকায়
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তুমি কোথায় লুকালে!—
খুঁজিতে খুঁজিতে গেল ভ্রমর-জনম।

তারপর মনে আছে? ভেলায় ভাসিনু
তুমি আমি নরনারী জীবন-সাগরে!
আশ্চর্য অবাক হয়ে আমি চেয়ে ছিনু,
কি জানি কেমন করে তুমি চেয়ে ছিলে!
কুসুমিত মুখ কান্তি ; মধু দেহলতা ;
দোল দোল জ্বল জ্বল রূপের গৌরবে?
সেকি প্রেম? ভালোবাসা? আকাঙ্ক্ষা? বাসনা?
কোন্ টানে চেয়ে থাকা এমন নীরবে?
চাহিতে চাহিতে কেন উঠিল তুফান?
তুমি আমি ডুবিলাম সে কোন্ সাগরে?

তারপর? পশুপক্ষী করিনু শিকার ;
ভীষণ অরণ্য মাঝে ব্যাধের জনম।
একদিন বনপ্রান্তে ত্রস্তা সে হরিণী
যেমনি ফেলিনু তারে বাণবিদ্ধ করে,
সজল সরোষ আঁখি ভরা বেদনায়
কোথা হতে বাহিরিলে বন আলো করে।
নতজানু হয়ে কত ক্ষমা চাহিলাম,
কহিলে না কোন কথা, ছুটে চলে গেলে।
ওগো বনলতা! ওগো করুণা-রূপিণী!
সে জনমে আর কভু করিনি শিকার।

বন শকুন্তলা তুমি বনের মাঝারে
লতা-পাতা-ঘেরা ক্ষুদ্র মোদের কুটির!
এ জনমে কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতাম
ফল মূল জল তুমি বহিয়া আনিতে!
একদিন আক্রমিল কৃতান্তের মতো
নিষ্ঠুর দস্যুর দল ঘোর অন্ধকারে!
শাণিত ছুরিকা লয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে
তোমার আমার বক্ষে বসায়ে দিলাম।
সেদিন একত্রে মোরা যাত্রা করিলাম
কোন্ টানে কি আশায় নিশার মাঝারে!

পরজন্মে জনমিলে মধুপদ্ম-আঁখি
বাজার নন্দিনী হয়ে! তব মালঞ্চের
আমি ছিনু মালাকর! প্রভাতে সন্ধ্যায়
গাঁথিতাম মালা, তুলি ফুল কাননের!

কি জানি কি বহে যেত শিরায় শিরায়!
কত হাসিতাম, কাঁদিতাম থাকি থাকি!
একদিন মালা দিতে কি দিনু কি জানি!
ধরা পড়ে গেনু! পরদিন বধ্য-ভূমে
যবে নিবু-নিবু প্রাণ, ঊর্ধ্বে চেয়ে হেরি
জ্বলিছে গবাক্ষে দুটি অশ্রুভরা আঁখি।

সৈনিকের বধূ তুমি সে কোন্ জনম?
ছিলে মোর বক্ষ ভরে! দেহ মন গড়া
অনলে বিদ্যুতে ফুলে! চোখে হোমশিখা!
চপলা চমকে বুকে! অঙ্গের লাবণি
কুসুম-স্তবক-সম মধুর কোমল!
অকস্মাৎ রণভেরী উঠিল বাজিয়া!
শত্রুর কৃপাণ যবে লাগিল হৃদয়ে,
একবার ভয় হল পাছে যত্নে রাখা,
চিত্ত মাঝে তব মূর্তি ছিন্ন হয়ে যায়!
পরক্ষণে হাসিলাম ; ফুরাল জনম!

আমি কবি, রাজগৃহে গাহিতাম গান
প্রহরে প্রহরে! কত শত জনমের
মিলন বিরহ-ব্যথা সুখ দুঃখ জ্বালা
ফুটিয়া উঠিত যেন সেই জনমের
প্রত্যেক গানের মাঝে! কারে খুঁজিতাম?
একদিন হেরিলাম লতার আড়ালে
কালো-কালো দুটি চোখ, ঢাক ঢাক যেন
এলোমেলো চুলে। সেই দৃষ্টি, সেই হাসি!
সেই কত জনমের চেনা চেনা ভাব!
চমকিয়া উঠিলাম। বন্ধ হল গান।

তারপর? পরজন্মে আমি চিত্রকর,
রূপসী রমণী তুমি ধনীর সংসারে!—
বহুজন সমাকীর্ণ বিপুল সে পুরী।
একদিন তোমারি আলেখ্য আঁকিতে
আমারে লইয়া গেল নয়ন বাঁধিয়া
কত রাস্তা গলি ঘুঁচি কত সিঁড়ি দিয়া
একটি কক্ষের মাঝে! সম্মুখে দর্পণ,
তারি মাঝে ভাসিতেছে প্রতিবিম্ব তব!
হৃদয়ের রক্ত দিয়া আঁকিনু সে ছবি।
হেরি কহে সবে, অপূর্ব এ চিত্রকর!

মনে কি পড়ে না সেই শিবের মন্দির?
আমি যে পূজারি ছিনু সেই দেবতার।
তুমি সেবাদাসী। কোথা হতে এসেছিলে
নাহি জানি। দিবারাত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে
ফুল্ল কুসুমের মতো রহিতে পড়িয়া!—
সেই ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি!
একদিন পূজাশেষে, আকুল অধীর
মত্তপ্রাণে যেই তোমা বক্ষে বাঁধিলাম,
চূর্ণ হয়ে পড়ে গেল মস্তকে আমার—
সেই জনমের সেই শিবের মন্দির!

একি সত্য? এ.কি মিথ্যা? জানি না জানি না
জানি শুধু এই লীলা অনন্ত কালের!
জানি আমি জন্মে জন্মে তোমারে পেয়েছি,
লভেছি পরশ কত ভাবে কত বার!
তাবি চিত্রগুলি যেন ভেসে ভেসে আসে
আলোক ছায়ার মতো মোর চিত্ত-বাসে।
তোমারেই পাই ওগো, বারে বারে বারে
তরঙ্গের মতো মোর মরম বেলায়।
মিলনে বিরহে কত! আর তারি সনে
যেন বেজে উঠে অনাদিকালের বীণা।

অনন্ত কালের লীলা নহে একদিনে।
সৃষ্টির প্রথম হতে চির প্রসারিত
মোর বাহু দুটি, জন্ম জন্ম করি ভেদ
বিদ্ধ করি ব্যাপ্ত করি যুগ যুগান্তর।
তাবি আলিঙ্গন মাঝে, ধরা পড়ে গেলে
সেই দিন! যেন কোন্ মহাদেবতার
মহা-মিলনের তরে মিলেছি আমরা!—
যুগে যুগে জনমে জনমে বার বার!
তাই সন্ধ্যাকাশ-তলে উঠিলে ফুটিয়া ;
ফোটনি ফোটনি প্রাণ, শুধু একদিনে।

(৭)

জীবন সাধন ধন তুমি যে আমার।
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,
    এমন মধুর করে
    এমন পরান ভরে।

কোন দিন হেরি নাই
পাই নাই কোন দিন ;
এস নাই কোন কালে
ফোট নাই কোন দিন,
এমন মধুর করে
এমন পরান ভরে!
সব শূন্য পূর্ণ করে
এমন জনম ভরে!
তুমি যে মধুর!
তুমি যে বঁধুর
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার!
এমন হারান ধন পেয়েছি আবার!
বারে বারে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে ফুটেছিল কত ঝরিয়াছে!
কত ফুল কত হাসি,
কত ভালো-বাসা-বাসি,
কত দুখ্ কত সুখ,
কত ভুল কত চুক্
কত-না অজানা ত্রাস,
কত বাঁধনের পাশ,
কত সোহাগের কথা,
কত বুক-ভাঙা ব্যথা,
কত আশা কত গান,
কত নিরাশার তান,
মিলনের ভাতি
বিরহের রাতি:—
যুগে যুগে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে গড়েছিল কত ভাঙিয়াছে!

জনমে জনমে পাওয়া না পাওয়ার মাঝে
যত কিছু ঝরেছিল সবই ফুটিয়াছে—
মরণের পারে পারে,
এক সঙ্গে একেবারে,
এমন মধুর করে,
এমন পরান ভরে!
যত ভাঙা গড়েছিল,
যত গড়া ভেঙেছিল,

সবই যে গো প্রাণপুটে
রাঙা হয়ে ফুটে উঠে,
অকস্মাৎ একেবারে
সেই আলো অন্ধকারে!
প্রাণ ঢল ঢল!
আঁখিভরা জল!
শত জনমের পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
যত না হারানো ধন, সবই মিলিয়াছে!

যাহা কভু পাই নাই, যার তরে আশা
না জেনে না শুনে প্রাণে বেঁধেছিল বাসা!
জন্ম জনম ধরে
সকল মরম ভরে
গুন্ গুন্ গাহি গান
জ্বল-জ্বল দু-নয়ান
খুঁজিত খুঁজিত যারে!
ওগো পাইলাম তারে!
সেই সন্ধ্যাকাশ তলে
নব শ্যাম-দূর্বাদলে,
একেবারে অকস্মাৎ
ভরিল রে প্রাণপাত!
ওগো তুমি সেই !
তুমি সেই, সেই!
যারে পাই নাই কভু! যার তরে আশা,
জীবন কমল-বনে বেঁধেছিল বাসা!

জন্মে জন্মে ঘুরে ঘরে এই যে মিলন!
এর তরে ছিল নাকি প্রাণে আকিঞ্চন—
শতেক জনম ধরে
সকল পরান ভরে?
সকল জনমে আঁখি
চাহেনি কি থাকি থাকি
কোন্ সুদূরের পানে
ভরা বর্ণে ফুলে গানে!
তারি চিত্র স্বপ্ন বেয়ে
ছিল নাকি মর্ম ছেয়ে?

তারি গল্প চিত্ত-হারা
কবেনি কি আত্মছাড়া?
গীত কাতরতা,
মিলন-বারতা
আনে নাই থাকি থাকি? হে প্রাণ-রতন!
শত জনমের চাওয়া এ মধু-মিলন!

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা!
যে দীপ জ্বালিনি ওরে! সেই দীপ জ্বালা!
অন্তরের অঙ্গে-অঙ্গে
কে দিল দুলায়ে রঙ্গে?—
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা!
এই যে হৃদয় মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে!—
যে দীপ জ্বলেনি আগে,
ওরে! তারি আলো জ্বালা!
যত সাধ সাধনার
যত গীত অজানার,
ফোটে কি মরমে
শতেক জনমে?
আঁখি মুদে চেয়ে দেখ, কি শোভন মালা!
প্রাণে প্রাণে চাও প্রাণ! কি আলোক জ্বালা!

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে!
হৃদয়-কমল মাঝে কি ধুম লেগেছে!
ডাঁটায় ফোটে যে ফুল
মোর ফুলে যে ফুটেছে!
ফুলে ফুলে ফুলাকুল
ফুলে ফুলে ফুটেছে!
লালে লালে রাঙা হয়ে
ফুটে ফুটে উঠেছে!
কে নেয় বে মধু লুটি
হেসে হেসে কুটিকুটি?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি?
মধুর তরঙ্গে
কে নাচে রে রঙ্গে?

ওরে দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ কি ধুম লেগেছে!
পরান-কমল মাঝে কে জানি জেগেছে!

যুগে যুগে পাওয়া পাওয়া না-পাওয়া মিলন
যেন রে সার্থক হল! পূরিল জীবন!
ওগো ফুল ওগো মিষ্টি!
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি!
ধন্য আমি ধন্য তুমি
পুণ্য সে মিলন-ভূমি।
কে বলে রে ধন্য ধন্য?
কে দেয় রে করতালি?

তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে?
কে বলে রে ধন্য ধন্য,
এ কার নূপুর বাজে?
কার পদরজঃ
পরান পঙ্কজ
শোভা করে? হে মিলিত! হে মধু-মিলন!
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি! ধন্য এ জীবন।

অগ্রন্থিত কবিতা ও গান

কৈশোরক

(১৮৮৫)

(১)

কেন কাঁদ হৃদয়?

হৃদয়-হৃদয় মোর
নাহি কিরে বল তোর
        ফিরাইতে এই স্রোতে?

দুর্বল শিশুর মতো
ভাসিবি কি অবিরত
        মিছে আশা বুকে কবে?

মুছে ফেল অশ্রুজল
কাঁদিয়ে বল্ কি ফল
        কাঁদিবি কাহার তরে?

যার তরে রাখ প্রাণ
সে তোরে দেয় না প্রাণ
        কেন প্রাণ কাঁদ তবে?

সাহসে করিয়া ভর
আনিয়া হৃদয়ে বল
        দাও তরী ভাসাইয়া!

যদি বা গরজে ঘন
উঠে ঝড় করে রণ
        দেয় তরী ডুবাইয়া—

কি ভয় কি ভয় তোর
ওরে হৃদয় আমার
        উঠিবি রে সাঁতারিয়া!

(২)

বাঁশি:

এ হেন চাঁদনি রাতে কে যায় বাজায়ে বাঁশি
পরান মাতায়ে যায়—ফুটে ফুল রাশি রাশি!

নাহি গো নাহি গো আর
বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার
নয়নের জল ;
শ্যামের বাঁশরি আর
বাজেনাকো বারবার
উঠে না উজান হায়
যমুনার জল!

(৩)

তবু কেন প্রাণ মন, এমন আকুল হয়
বাঁশরি বাজায়ে গেলে পরান মাতিয়া রয়?
বৃন্দাবন গেছে মরে, বাঁশি কেন আজ জেগে
স্মৃতিটুকু কেন এসে পরান মাতায়ে যায়?

নাহি যদি রাধারানী নাহি যদি শ্যামরায়
কি কাজ বাঁশরি দিয়ে, কেন বা বাজায়ে যায়?
বাঁশরি ভাঙিয়ে ফেল, আর বাজাওনা বাঁশি—
পরান চমকি উঠে—ফুটে স্মৃতি রাশি-রাশি।

(৪)

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

ভক্তিপুষ্প দিয়ে মাগো! গাঁথিয়াছি হৃদিহার
বড় সাধ দিব তুলে—ওই চরণে তোমার!
ব্যথা মোর স্মরি যত দহে হৃদি দহে তত
আশা কত হয় হত, বহে হৃদে নীরধার!
পাপ চক্ষে দেখি যবে মোহপূর্ণ এই ভবে
বড় ভয় হয় প্রাণে, কাঁদে প্রাণ বার বার!
তোমা যদি করি ভয়, তবে আর কিসে ভয়
মোহ যাবে আলো হবে সংসারের অন্ধকার!
তুমি যদি আলো করে থাক মা হৃদয় 'পরে
দুঃখ মোর সুখ হবে, দূরে যাবে অন্ধকার।

(১)

তুই!

প্রভাতের তারা তুই
প্রভাতে ফুটিবি শুধু
স্বপনের পদ্ম তুই
আমার পরান বঁধু!
প্রভাতের পানে চেয়ে
অরুণিম আঁখি তোর
আয় রে নিলাজ মেয়ে
তুই যে প্রভাত চোর!

(২)

বেহাগ

মধুর যামিনী আজি বল্ মোরে বল্
এ ছার পরান লয়ে বাঁচিয়া কি ফল!
আশাগুলি বুঝে ওরে, ধীরে ধীরে পড়ে ঝরে
স্বপনের খেলা লয়ে কেমনে খেলিব বল্
ক্ষীণ আশা বলে চল্, হৃদয়েতে নাহি বল
চলিব কেমনে বল্, নয়নেতে বহে জল!

(৩)

তুমি

চৌড়ী—একতালা

তুমি যে রেখেছ মোরে, তাই তো রয়েছি বাঁচি
ডাকিবে যখন তুমি, তখন মুদিবে আঁখি!
জনমের সাধগুলি, তব হাতে দিনু তুলি
পূরালে পূরাবে তুমি—না পূরালে রবে পড়ি!
তোমারি আদেশ লয়ে, ভ্রমেছি এ দেশে ওহে
সম্পদে বিপদে তবে—আমার ভরসা তুমি!

(৪)

বেহাগ—আড়া

আঁধার ভুলিতে চাই
আঁধার ভুলিতে গিয়ে—আঁধারে ডুবিয়া যাই!
আঁধারের পায়-পায়
পরান ধাইতে চায়
একটু বহিলে বায়—কে যে আমি ভুলে যাই!
ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে
আঁধার আঁধার ওরে—
জীবনের কাজ সেরে রহিল পড়িয়া ;
মায়ার বাঁধন তায়, যখনি ভাঙিতে চাই
বিস্মৃতি সাগরে আমি তখনি ডুবিয়া যাই।

(৫)

বেহাগ-আড়া

আমার ভরসা তুমি
সুখে থাকি দুঃখে থাকি আমার ভরসা তুমি!
বিপদে পড়িলে পরে আমার পরান 'পরে
রবে তুমি আলো করে জানি আমি জানি আমি।
সুখে থাকি দুঃখে থাকি আমার ভরসা তুমি!
তোমারে ধরিয়া রব, আর সব ছেড়ে রব
আঁখি 'পরে আলো করে রবে তুমি রবে তুমি ;
তব মুখ পানে চেয়ে, রব ওহে এ সংসারে
বিপদে সম্পদে তাই আমার ভরসা তুমি।

(৬)

তোমার করুণা বিনা মোরা জানিনাকো আর
সংসারে পাঠালে যদি রেখ পদে অনিবার!
শান্তি দিয়ো, প্রীতি দিয়ো, সত্যের আলোক দিয়ো
উষার হৃদয় দিয়ো, বল দিয়ো বার বার!
ক্ষুদ্র এ শিশির বিন্দু, ওগো করুণার সিন্ধু,
সংসার উত্তাপে যেন, নাহি যায় শুখাইয়া,
যে প্রেমে ফুটাও ফুল, বিকাশ তারকাকুল
সে প্রেমে বঞ্চিত কর হৃদয় কুসুম হায়।
জীবন গহন মাঝে, বিপদ আঁধার আছে

সদা ফিরে পাছে-পাছে কাঁদে প্রাণ বার-বার!
শত বিঘ্ন কেটে যাবে, আঁধার আলোক হবে
তুমি যদি আলো করে থাক হৃদে অনিবার!
আঁধার পিছনে রাখি সম্মুখে আলোক দেখি
তোমার চরণে যেন জীবন কাটে গো তার।

(৭)

কেন এসেছিলে, কেন চলে গেলে
মায়া পাশে বেঁধে প্রাণ!
হিয়ার মাঝারে, কেন দিয়ে গেলে
আকুল তিযাষ গান!
মুহূর্তের তরে না দেখে তোমারে
আকুল হয়েছি বড়।
দুর্বল পরানে সহিব কেমনে
দীরঘ বিরহ ঝড়!
স্নেহমূলে তবে বাঁধি ভালো করে
আনন্দে পরান মোর,
বেঁধে দিলে যদি দেখো নিরবধি
যেন গো ছিঁড়ে না ডোর।
আকুল পরান আকুল নয়ান
আকুল নয়ন বারি!
আকুল বাসনা কেমনে বল না
সম্বরি কেমন করি!
কাছে ছিলে তাই হেসেছি সদাই
করিয়াছি অভিমান!
দূরে গেছ চলে ভাসি অশ্রুজলে
কি করি বুঝে না প্রাণ।

১৯১০-১৯১৬'র মধ্যে লিখিত
গান ও কবিতা

(১)

একি বেদনার বাস পরালে আমায়!
একি জ্বালা জ্বেলে দিলে হিযায়-হিয়ায়!
ওগো নিদয়! ওগো নিঠুর!
ওগো মোহন! ওগো মধুর!
একি দুঃখ একি ব্যথা প্রাণে গরজায়!
হয় দাও-দাও-দাও, দাও প্রাণ ভরে
নয় লও, লও-লও, সব শূন্য ক'রে ;
প্রাণ যে দেখিতে নারি এত যাতনায়
এই ঘোর জ্বালাভরা আশা নিরাশায়!
ওগো নিদয়! ওগো নিঠুর!
ওগো মোহন! ওগো মধুর!
কাতরে ডাকিছি আজ প্রাণের জ্বালায়!

(২)

এ যে আমার ফুলের হার
এ যে আমার কাঁটার মালা!
এ যে সকল মধুর মিঠে
এ যে আমার বিষের জ্বালা!
দিয়েছ যা কিছু, নিতে যে হবে
যত না সুখ যত না জ্বালা!
ওই দেখ তব চরণ মূলে
দিয়েছি ভরে আজ কিসের ডালা।

(৩)

ওগো হৃদয় রতন! ওগো মনেরি মতন!
কি দিয়ে পূজিব আজি সাজাব চরণ?
তুমি যে আসিবে আমি বুঝিতে পারিনি
আমি যে রাখিনি ডালা সাজায়ে!
কি গান গাহিব আজি! কি শুনিবে বল?
কাঁপে তনু থরথর হৃদয় উছল
পরান বীণার তার সবি ছিঁড়ে গেছে
সে তারে কি সুর দিব বাজায়ে!

কেমনে গাঁথিব মালা, কোথা পাব ফুল (গো)
আমি যে জীবন ভরে করিয়াছি ভুল!
আমি যে রেখেছি শুধু যাতনা কুসুম (গো)
হৃদয় মন্দির মাঝে কুড়ায়ে!

(৪)

অবসাদ

এই তো সেই তমাল তলে
মোহন মালা দিলে গলে,
আদর করে কইলে কথা
ভিজল মালা চোখের জলে!

সেই তো সেই মাধবী রাতে
জড়িয়ে নিলে বুকের 'পরে
সকল সুখ সকল ব্যথা
গলিয়ে দিলে সোহাগ ভরে!

আজি বঁধু কোথায় তুমি
হা হা করে তমালতল!
কোথায় গেল মুখেব হাসি
কোথায় গেল চোখের জল!

সকল শুষ্ক মরুভূমি,
হা হা করে হৃদয়তল!
কেন নিলে প্রাণের হাসি
কেন নিলে চোখের জল?

(৫)

আজিকে বঁধু থেক না দূরে
গেয়ো না এমন করুণ সুরে!
ঝড়ের মাঝে বাদলা হাওয়ায়
ঝড় উঠিছে পরান পুরে!
আজিকে বঁধু থেক না দূরে!
আজি যে তোমার সোহাগ তরে
সকল দেহ উথলে পরে!
আজি যে তোমার পরশ লাগি
ঝর ঝর ঝর নযন ঝরে!

আজি যে ঘোর বিরহ বাহি
উঠেছে কত পরান পুরে!
আজিকে বঁধু থেক না দূরে।

(৬)

এস আমার চোখের আলো
এস আমার প্রাণের মণি
এস আমার সাধের স্বপ্ন
এস আমার আশার ধ্বনি!
এত দিনের আশার আশে
নয়ান জলে বয়ান ভাসে!
এস আমার সাধের স্বপ্ন
এস আমার হৃদয়-মণি!
এস আমার সুখের সাগর
এস আমার দুঃখের খনি!

(৭)

এই যে ছিল কোথায় গেল
কেন আমায় জাগাইলি!
এমন মধুর বঁধুর ঘুম
কেন সে ঘুম ভাঙাইলি?
অচেতনে ছিলেম ভালো
বুকে করে বুকের আলো ;
কেন তোরা এমন করে
প্রাণের আলো নিবাইলি?
সেই যে তারে পেয়েছিলাম
প্রাণের মাঝে ছুঁয়েছিলাম!
কেন চেতন বেদন দিয়ে
প্রাণের ব্যথা বাড়াইলি?
সেই যে আমার বুকের মাঝে
বরণ করা বনমালী!—
স্বপন যদি দেখেছিলাম
কেন স্বপন ভাঙাইলি?

(৮)

নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার!

(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার!

সেই যে শিরে মোহন চূড়া
সেই তো হাতে মোহন বাঁশি
সেই মুরতি হের্‌ব বলে
পরান বড় অভিলাষী!

(একবার) বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জ দুয়ার
এসো আমার পরশ মানিক
বেদ-বেদান্তে কাজ কি আর।

(৯)

দাও দাও প্রাণের নিধি
প্রাণের প্রাণে বেঁধে দাও!
(আমার) সকল অঙ্গ কেঁদে মরে
চোখের কাছে এনে দাও!

আমি সইতে নারি দূর থেকে
চোখের কাছে এনে দাও,
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের 'পরে বেঁধে দাও।

ভাবতে গেলে তোমার কথা
সকল অঙ্গ শিহরে!
(আবার) ভুলতে গেলে তোমার কথা
বুকের মাঝে বিহরে।

আমি ভাবতে নারি ভুলতে নারি
তোমার কাছে ডেকে নাও
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের 'পরে বেঁধে দাও।

(১০)

মিটায়ো না এই পিয়াসা
এই তো আমার মিষ্টি লাগে!
ওগো বিরহী! চির বিরহী—
এই তৃষা যেন নিত্য জাগে!

মিলন আমি চাই না যে হে
এই তিয়াসা যেন থাকে
চোখের জলে এত মধু
প্রাণবঁধু হে প্রাণবঁধু
মুছায়ো না চোখের বারি!
নাইবা এলে আঁখির আগে।
নাইবা হল মিলন যদি
এই বিরহ নিত্য জাগে

(১১)

মেঘের মাঝে ওই যে ভাসে
নীল সাগরে নীলমণি!
আমার প্রাণের মাঝে কেমন করে
আমি ঝাঁপ দিব তায় এখনি!
ওরে ওই যে ভাসে ওই যে হাসে
নীল সাগরে নীলমণি!

এত দিনের সাধের ধন
ওই যে ডাকে ভয় কিরে মন!
ওরে তোরা ধরিস না কেউ
আমি ঝাঁপ দিব আজ এখনি!
ওই যে ডাকে ওই যে হাসে
নীল সাগরেব নীলমণি।

(১২)

ডাক

কেন ডেকে পাগল কর, ওগো আমার প্রাণের হরি!
কেমন করে যাব বল, ডাক শুনে যে কেঁদে মরি!
প্রথম ডাক বিহান বেলা
শয়ন ছেড়ে চমকে উঠি!
সারা রাতের শিশির ধোয়া
ফুলের মতো থাকি ফুটি!

আবার ডাক দুপুর বেলা
বিজন আমার আঁধার ঘরে!
পেতে পেতে পাই না তাই
হৃদয় ছাপি নয়ন ঝরে।

আবার ডাক সাঁঝের বেলা
করুণ তব গগন তলে!
পরান বেয়ে কি জানি গো
চোখের কোণে ছল ছলে।

আবার ডাক আবার ডাক
গভীর ঘন আঁধার রাতে
মরমভরা করুণ ব্যথা
উছলে ওঠে আঁখির পাতে!

আবার ডাক আবার ডাক
ওগো আমার পাগল করা,
আবার ডাক আবার ডাক
ওগো আমার সকল জরা!

আবার ডাক আবার ডাক,
ওগো আমার পাগল হরি!
কেমন করে যাব বল,
ডাক শুনে যে কেঁদে মরি।

(১৩)

বাঙালির সঙ্গীত

আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ
গাহিছে আশার গীতি, পূর্ণ কর আশ ;
বাঙালি নহে গো ভীরু নহে কাপুরুষ,
বাঙালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।

করহ সার্থক আজ সত্যেরে সাধিয়া
দূর করি হিংসাদ্বেষ বিদ্রূপ বিলাস ;
এই মহামন্ত্র রাখি বক্ষেতে বাঁধিয়া
বাঙালির আছে আশা, আছে ইতিহাস।

ওই হের, দেবতারা প্রসন্ন হইয়া
লিখেছে গগন-ভালে রবি-রশ্মি দিয়া—
বাঙালি নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙালির আছে আশা, আছে ইতিহাস।

ওই শুন, দৈববাণী গগনে গর্জিয়া
আলোড়িছে বাঙালির সর্বপ্রাণমন ;
আপন কর্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন !

না না অলীক কথা মিথ্যা প্রলোভন
সঁপিয়ো না সর্ব আশা বিদেশী-চরণে,—
দূর কর দুর্দিনের মিথ্যা আরাধন
সত্যেরে সহায় কর জীবনে মরণে !

দেবতা কহিছে কথা অন্তর ভরিয়া
দেবতার বাক্যে আজ পূর্ণ কর মন !
আপন কর্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন।

(১৪)

নারায়ণ

জগৎরূপে যে বিকাশ তোমার
তাহা কি ভুলিতে পারি ?
তাই অম্বুমেলায়, সৌরকিরীটে,
শষ্প আস্তৃত শ্যাম পাদপীঠে,
তাই নীরদ কুন্তলে নির্ঝরোপবীতে,
স্নিগ্ধ কৌমুদীবরণ সিতে,
সদা নিরখিছ চিতহারী !
তাই আঁখি রেখে ওই আঁখি-তারকায
আপনা পাসরি প্রভাত সন্ধ্যায়
আঁখি-পথ দিয়ে ও মাধরী পিয়ে
যেন বা তিয়াষ মিটে না।

বিচিত্র তোমার এ কি রূপ হরি !
ধরে না নয়নে বুঝি পড়ে ঝরি,
যেন জনম-জনম দেখি আঁখি ভরি
তবু দরশ-পিয়াস ছুটে না।

তোমার মাঝারে হব না অচিন,
তোমা হতে যেন রহি চির-ভিন,
জলবুদ্‌বুদ্ জলে হলে লীন,
যে সুখ—সে সুখ চাহি না।

কবিতার কথা

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে। আমি ভাষার কথা বলিতেছি না, সাহিত্যেরই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্য-বিষয়ে, বিশেষত গীতিকাব্য লইয়া, নানাপ্রকারের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন আধুনিক বাঙলা কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতার অভাব। আবার কেহ-কেহ বলেন, ভাবুকতাই মনুষ্যজীবনের সারাংশ। এই ভাবুকতা ছাড়িয়া দিলে কবিতা ফুটিবে কি করিয়া? প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইংরাজি সাহিত্যে Realism ও Idealism লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিত, ইহা কতকটা সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজি সাহিত্যে ইহার একটা মোটামুটি রকমের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই মীমাংসা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের skylark-এর শেষ দুইটি ছত্রে আছে—

Type of the wise who soar but
never roam
True to the kindred points of
Heaven and Home!

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য—এই দুয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই কি আমাদের কবিতার আদর্শ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদের প্রাণের মাঝে দুইটা ভাব সর্বদাই দেখা দেয়। একটা আমাদের মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে বলে, আর একটা আমাদের মাটি ছাড়াইয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরে। এই সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, এই দুই লইয়াই অমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি না। ছাড়িয়া দিলে, মনুষ্যজীবন বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার অঙ্গহানি হয়।

মনুষ্যজীবন কি? আমরা প্রতিদিন যেমন করিয়া জীবনযাপন করি, তাহাই কি প্রকৃত জীবন? আমরা সকলেই সকালে উঠিয়া যে যার কর্মে নিযুক্ত হই, সমস্ত দিন কর্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসি এবং তৎপরে বিশ্রাম করি। যাহার কর্ম করিতে হয় না, সে-ও শয্যা হইতে উঠিয়া কোন রকম গল্প করিয়া, তামাক টানিয়া দিনটা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনের বহিরাবরণ। ইহার আর একটি দিক আছে। তাহাকে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতি বলা যাইতে পারে। যে সমস্ত দিন কর্ম করিয়া কাটায়, সে-ও মাঝে মাঝে, ভাবিতে ভাবিতে, তাহার কর্মের সার্থকতা যেখানে, সেই রাজ্যে গিয়া পৌঁছায়। যে সমস্ত দিন আলস্যে অতিবাহিত করে, সে-ও একেবারে অসার না হইলে মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশীরবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। এই সব মুহূর্তগুলি জীবনের অনন্তমুহূর্ত। এই মুহূর্তেই আমরা প্রকৃত জীবনযাপন করি এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সার্থকতা বুঝিতে পারি। কৃষকের জীবন লইয়া সেই কবিতা লিখিতে পারে, যে কৃষকের জীবনের সার্থকতা বুঝিয়াছে। কেমন করিয়া কৃষক প্রাতে উঠিয়া পান্তা ভাত খাইয়া লাঙল লইয়া মাঠে যায়, কেমন করিয়া সে চাষ করে, সে চাষ করিতে করিতে কি গান গায়, সে বাড়ি ফিরিয়া কেমন করিয়া বিশ্রাম

করে, কি খায়, কি পরে—এই সব খুব জাকাল রকমের ভাষায় বর্ণনা করিলেও কবিতা হয় না। কেবল একখানি সুন্দর আলোক-চিত্র হয়।

আজকালকার দিনের অনেক কৃষক-বিষয়ক কবিতা এই প্রকারের: এই সব কবিতায় প্রত্যক্ষ বাস্তবতা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বস্তুতন্ত্রতা নাই,—যাহা লইয়া কৃষকের জীবনের সার্থকতা, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। কৃষক বুঝুক, আর নাই বুঝুক, তাহার দৈনন্দিন জীবনের বাহিরে একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই অন্তঃপ্রকৃতির অনুভূতি যার নাই, সে কখনই কৃষকের জীবনকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। সে যাহা বুঝে ও যাহা ধরে, তাহা বাহিরের খোসা-মাত্র। সেই খোসা লইয়া যাহা লেখা যায়, তাহা কবিতা নয়। যে কবি সেই জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পাইয়া, সেই জীবনের ভিতর ও বাহির দুই দিককেই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারেন, তিনিই যথার্থ কৃষকের কবিতা লিখিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বার্নসের Ploughman-এর কথা বলা যায়। আধুনিক বাঙলা কবিতায় কালিদাস বাবুর "পর্ণপুটে" কৃষকের ব্যথা নামক একটি কবিতা যথার্থ কৃষকের কবিতা—

ক্ষেতের কাজ করতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই
কাজেতে আর নাইকো মন, আরামে সুখ নাই।
তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে জ্বলি,
ধানের চারা উপড়ে ফেলি আগাছা কাটা বলি'।

শান্তিপুরে, তোমার ডুরে, এ বুকে চাপি ধরি,
চোখের জলে বক্ষ ভাসে মেজেতে রহি পড়ি।

কৃষকের কবিতার বিষয় যাহা বলিলাম, সব কবিতার বিষয়েই তাহা খাটে। শুধু নায়ক-নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌঁছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জ্ঞানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির— সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত বলিলাম, সেই অনন্তমুহূর্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্তেই আমাদের হৃদয়-মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখন কবিতার সৃষ্টি হয়।

তবে কবিতার রাজ্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা লইয়া তর্ক করার অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ধরণী আকাশের গায় ও আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে। এ মিলন অপূর্ব, গভীর, অনন্ত! দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে-মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম, এই তো জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলনভূমি অপূর্ব. অনন্ত! বুঝিলাম, যাহা আত্মা, তাহাই দেহ ; যাহা অনন্ত, তাহাই সান্ত ; যাহা পরমার্থ, তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলনমন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই— যাহা আছে, তাহাই জীবনের স্বরূপ! এ জীবন লইয়াই কবিতা! যে শুধু ছোবড়া খায়, সে কখনও ফলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবড়া না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সে-ও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের অপ্রন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিত লোক সৃজন করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহনির্মাণ করা যায় না, সেইরূপ কল্পিত-লোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই কল্পিত-লোকের কোন সত্তা নাই। এ মিলন-মন্দির সত্য, সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।

আমি দু-একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"অন্তরে বাহিরে কুটু-কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি"—

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সেই মহামিলনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি।
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি
দুখ যায় তাব ঠাঞি!"

আজকাল এরূপ কবিতা শুনিতে পাই না! আর কি শুনিতে পাইব না?

রাধিকার পূর্বরাগের কথা মনে করুন।

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।"

এও সেই মহামিলনমন্দিরের গীতধ্বনি! যাঁহারা শুধু বাহিবের দিক্‌টা দেখেন, তাঁহারা হয় তো বলিবেন, "পূর্বরাগে আবার মিলন আসিল কোথা হইতে?" আমি যে মহামিলনের কথা বলিতেছি, তাহাই যে জীবনের স্বরূপ,—পূর্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বিরহ ইত্যাদি সেই স্বরূপেবই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। সুতরাং পূর্বরাগের গীতই হউক, কি মিলন অথবা বিরহের গীতই হউক, জীবনের সকল গীতই সেই মহামিলনমন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। যিনি যথার্থ কবি, তিনি সেই মন্দিরে পৌঁছিয়া তাহারি গান বুকে করিয়া বহন করিয়া আনেন! তাই আজ এত বৎসর পবেও এই কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

চণ্ডীদাস যে সাধক ছিলেন। তিনি যে নামের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নায়ক-নায়িকার নাম লইয়া লিখিত দুইটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে। একটি এই—

শুনেছি-শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি শুনেছি তাহা,
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা!
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আন্‌মনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম।
বালার খেলায় সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে,
স্বজনেরা তায়, নলিনী নলিনী
নলিনী বলে গো তাকে!
নলিনী মতো হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম!

আর একটি এই—

ভালোবেসে সখি! নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো তোমার
চরণ-মঞ্জীরে!

বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাসের কবিতা যে রাজ্যের, এ দুটি কবিতা সে রাজ্যেরই নয়—সে মহামিলনমন্দিরের অনেক দূরে।

প্রেমে ডগমগ-হৃদি রাধিকা নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। সে ভাবিতেছে, তাহার কি হইল। সে যেন সংসারে থাকিয়াও সংসারে নাই। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ প্রেমের যে প্রভাব, তাহা প্রাণে-প্রাণে অনুভব করিতেছে,—

সই! পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাত দিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।

রসের স্বরূপ, পিরীতি-মুরতি
কেবা করে পরতীত।
পিরীতি মন্থর, জপে যেই জন,
নাহিকো তাহার মূল!
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতিকুল।
সে রূপ-সায়রে, নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি না দিয়া।
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে।

রাধিকার হৃদয়দর্শী চণ্ডীদাস, রাধিকার হৃদয়ের কথা সকলই জানেন। সংসারে থাকিয়াও যে সে সংসারের বহুদূরে, তাহা তিনি জানেন। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আছয়ে ঘরে বটে, কিন্তু ইঙ্গিত পাইলে অনল দিয়ে দুয়ারে।" আর একটি কবিতাতে কবি বলিতেছেন, "তোমার এ রকম তো হবেই। তুমি যে—

পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিবীতি বাস।"

তার পর মিলনের ও সম্ভোগের কথা। মিলনের মাঝে রাধিকা বলিতেছে—

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা!

এ তো শুধু বাহিরের সঙ্গীত নহে, এ যে অন্তর্দৃষ্টিপরিপূর্ণ। শ্যামের প্রেমে গদগদ-প্রাণ রাধিকা এ কোন্ শ্যামের অনুসন্ধান করিতেছে? চণ্ডীদাস জানে ; রাধিকা না জানিলেও তাহার হৃদয় জানে। তাই সে মিলনের মধ্যেও গাহিয়া উঠিল—

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা!

প্রত্যেক মিলনের মধ্যেই একটা বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকে। এ গান তাহারি প্রথম সূত্র। এই বিরহ তার সম্ভোগে আরও সুন্দরভাবে, গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
দুহুঁ পরানে পরান বাঁধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

ইহার পরের অবস্থাই বিদ্যাপতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুর যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝিনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

কেমন করিয়া নয়ন তিরপিত হইবে, নয়ন যে অতৃপ্য! কেমন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে, প্রাণ যে জুড়াইবার নয়! আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়া অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চাই। তাই প্রত্যেক মিলনের মধ্যে মহামিলনের অনুসন্ধান করি, তাই সম্ভোগেও এক মহাবিবহের ছায়া পড়ে, তাই সম্ভোগ-মিলনের মধ্যেও নায়িকা গাহিয়া উঠিল—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি!

এই কবিতাগুলি Realistic ও নয়, Idealistic ও নয়, আমি যে মহামিলনমন্দিরের কথা বলিয়াছি, তাহারি ধ্বনি। এগুলি জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধবনি পাওয়া যায়। তাই আমরা এ কবিতাগুলিকে কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

ইহাই হিন্দুর আন্তরিক ভাব। ইহাই বাঙালি কবিতার প্রাণ। বঙ্গসাহিত্যে—চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণ কমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্যন্ত—এই কবিতার একটা অক্ষুণ্ণ ধারা দেখিতে পাওয়া যায়!

সে ধারা কোথায় লুকাইয়া গেল? আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না কেন? ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাঙলা কবিতার যে প্রাণ, তাহাই হারাইয়া ফেলিব? আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ কথা ভালো লাগিতেছে না। তাঁহারা হয় তো বলিবেন, কবিতা কি চিরকাল এক রকমই থাকিবে? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের পবিসব বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমন করিয়া চলিবে? কিন্তু আমি তো কোন গণ্ডীর কথা বলি নাই, আমি কবিতার রাজ্যের কথা বলিয়াছি, কাব্য-লোকের কথা বলিয়াছি। এই কাব্য-লোকের কোন সীমা নাই। এ রাজ্য অসীম, অনন্ত। জীবনের পবিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে, কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইব্‌সেন হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। নানা ফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মতো মেটার্‌লিঙ্কের পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে। আমরা সে বিষয়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কবি যদি সেই কাব্যলোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা। এক দিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জিনিস নহে। বিষয যাহাই হউক না কেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, সেই মহামিলনমন্দিরের সাধক হওয়া চাই। সে অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুবা চাই! নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া, বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া, কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদী রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।

বাঙলা কবিতার সেই সরল সত্য প্রাণ আমরা হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাষা ও ধরন ক্রমশ কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া আসিতেছে। আজকালকার দিনে।

এই হিয়া দগ্‌দগি পরান পোড়ানি
কি দিলে হইবে ভাল—

এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছানিয়া বুনিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে হয। তা না হইলে না কি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা সবাই খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে বসি। একটি ভাব কোন রকমে জোগাড় হইলেই তাহাতে ভাষার রং মাখাইতে বসি এবং সেই রঙিন জিনিসটাকে লইয়া, বল-খেলার মতো তাহাকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির হৃদয় হইতে কোন ভাবই সহজে, সরলভাবে পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন তাহাকে তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন, আর সেই অবসবে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর কবির ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

কিন্তু ইহা তো বাঙলা কবিতার ধরন নয়। যে পরিমাণে প্রাণের অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরনেব মাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙলা কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাই আজকাল বাঙলা কবিতাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরনের এত বাড়াবাড়ি।

সেই সোজা সরল ধরনের দুই একটি কবিতা মনে পড়িতেছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা ওই ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কবিতায় অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকিলেও তাঁহার ভাষা ও ধরন অনেকটা সেই প্রকার সহজ, সরল প্রাণময়—

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরুপম
নয়ন তো মম মনোমতো নয়।
যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন
হতেছিল সম্মিলন ;
নয়ন পলক দিলে, সেই সুখের সময়!

ইহাতে খেলিবার চেষ্টা নাই,—ইহার গতি সরল।

আবার দেখুন,—

মন যে আমার পড়েছে সই উভয় সঙ্কটে
এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,
আব এক কর্ণ বলে, আমি বধির হয়ে র'ব।
এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,
আর এক নয়ন বলে, আমি মুদিত হয়ে থাকি।
এক করে সাধ করে, ধরে কৃষ্ণ করে,
আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তারে।
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়
আ'র এক পদে, পদে পদে বারণ করে তায়।

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অজ্ঞান। সখীরা তাহার কানে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল। অমনি রাধিকার কৃষ্ণস্ফূর্তি!

বহুদিন পরে মোরে মনে করে
এসেছিল ঘরে বঁধু যে আমার।

আমি জান্‌লাম জান্‌লাম—
বঁধুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধে পশি নাসারন্ধ্রে
মৃতদেহে করলে জীবন সঞ্চার।
সখি! আমি ছিলাম অচেতনে,
ভাল, তোরা তো ছিলি চেতনে,
হায়! হায়! যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,
কেন অযতনে হারালি আবার।

এইরূপ ভাষা এখন আর শুনিতে পাই না। নিধুবাবুর 'তোমারি তুলনা প্রাণ তুমি এ মহীমণ্ডলে', কিংবা বিহারীলালের—

"নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার!"

এইরূপ অনেক কবিতা বঙ্গভাষায় আদরের সামগ্রী।

আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয়, যেন আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ, সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা অন্য প্রকারের, আমরা প্রত্যেক কথা এত ঘুরাইয়া বলি যে, সাদাসিধে লোকে বুঝিতে পাবে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মতো বক্রগতি। তার ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগ রাগিণী-আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে, সে ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই, সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতেই পারে না।

আমাদের কবিতার এই শোচনীয় অবস্থার হয় তো যথাযথ কারণ আছে। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপণ্ডিত, তাঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু যথেষ্ট কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে তো মন মানে না! প্রাণ যে চায় সেই বৈষ্ণব কবিদিগের সব-জুড়ানো সুধাস্রোত। মন যে চায় সেই বাঙালির কবিতা। বাঙলার মাটি, বাঙলার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙালির কবিতাকে পুনর্জীবিত করিতেই হইবে। কবিতা লইয়া আর খেলাধূলা ভাল লাগে না। সংসারের খেলাঘরে খেলিতে খেলিতে যাহারা প্রাণের বস্তুর সাক্ষাৎ পায়, তাহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু যাহারা প্রাণের বস্তু লইয়া খেলা করিতে বসে, তাহাদের মতো দুর্ভাগ্য আর কার? বঙ্গসাহিত্যের সেই হারানো ধারাকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বতী নদীর মতো বালুকারাশির মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে।

আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশব সাহিত্যসেবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বড় বড় লেখকেরা আজকাল কি লেখেন, আমি হয় তো ভাল করিয়া জানি না। হয় তো আমার বুঝিবাব ক্ষমতাই নাই। কিন্তু বাঙলা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা আমি বুঝি ও কতকটা জানি। তাহারই গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই, সত্য, কিন্তু আমি তো সাধক নহি, সাহিত্যমন্দিরপ্রাঙ্গণে সামান্য কিঙ্করমাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবাব ক্ষমতা আমার নাই। যাহাদের আছে, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী!

আজ পরিণত বয়সে ওপারের কথাই বেশি মনে হয়। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতামন্দিরে আমি যাহাকে বাঙলা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় সেই মহামিলনমন্দিরের ধ্বনি আমরা কানের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

আবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সকল সাহিত্য সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

বাঙলার গীতিকবিতা (অংশ)

এখন কথা হইতেছে, কাব্য কি? গীতি-কবিতা কি? সাহিত্য কি? সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা রূপের ডালি হইয়া এক দিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শও এক দিনে, এক মুহূর্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম; —রূপে রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুলিয়া আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম ও বিকাশের ধর্মই তাই। অনন্ত কাল হইতে তাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডীদাস গাইয়াছেন,—

"মাটির জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ!
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।"

সিতাসিত, কাল, পক্ষ, দিবস, রজনী, সবই ছিল, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতি-কবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণত সোজা কথায় হয় তো বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবন্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ তাহার এক সামাজিকতত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার এক মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কল্প-কলার স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়মাঝারে যে স্বচ্ছ দর্পণখানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়! প্রথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃ-প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙিয়া, তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ঘিরিয়া, কুটির রচনা করিয়া আপনাদের থাকিবার মতো আশ্রয় করিয়া লইত; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পব পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাবজাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরের জলধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখির সমবেত কলরবোথিত গানের

মতো তাহাদের ভাষা ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম রসানুভূতি, তাহাই সমাজ-বিজ্ঞানবিদের বিশদ কথা।

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরস্পর-পরস্পরের অনুভূতির দ্বারা নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশ জনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্য আকার লইয়া অন্য আবেগের ধারায় নূতন রকমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষে সহজাত সংস্কারবশে যুগল মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান-প্রদান, ভাব-অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না-পাওয়ার রস উপজয় হইল। গানের ধারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি-আমি, আমি-তুমি, হাসি-কান্নার বিলাস!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার ভাব ও আকার পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার স্ফূর্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়। না পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দন এক অপূর্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। জীবন মৃত্যু, শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার-যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তার পর, দিন গেল, নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে জড়তা কাটিয়া গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা আসিল। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাঁদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব জাগিল, রূপতৃষা আসিল, ভালোবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

কিন্তু কল্পকলার যে স্রষ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখির বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে সেই নিত্য সত্য রংরাজের রং-এর খেলা! তাঁহার তো আদি অন্ত নাই। কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙিয়া গড়িয়া জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন; বিশ্বপ্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে? আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার করিবে কে?

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা ফেলা ও প্রত্যেক পা ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপতৃষাস্বভাব, সৃষ্টি-রক্ষাব জন্য মিলিবাব পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলে, এ তৃষা নয়, এ স্ফূর্তি, রূপেব ভিতর দিযা রূপকে পাইবাব, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য। মাটি ফাটিয়া তৃণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখি গায়, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলার রঙের পর রং ঝলকিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয়; সে 'আপনি' সেই লীলামৃতরসাধার, এ সবই তাঁরই প্রেমের বিচিত্র রূপ-রস! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সেও তাঁহারই লীলা। এ বিশ্বসৃষ্টি তাঁহারই, এ জীবসৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই; ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। ইহা পূর্ণ, রূপে-রূপে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত, জ্বলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস!

কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল-অতীত। সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির নীতিও ধর্মের অতীত। কল্পকলা, সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ্ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্তের ঋদ্ধি।

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ, পরস্পরকে ধরিয়া আছে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealistও নয়, Realistও নয়, সে Nature-list। শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত ধরিয়া আপনা আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদ্ও তেমনিই ভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া সৃষ্টি করেন। জীবন যে সাধনা, সে তো স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট শিল্প, এ মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে, আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ-জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য। মায়া বলিয়া কোন জিনিসই নাই। জগন্মিথ্যা নয়, এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণে যেমন অন্ধকারা যামিনীতে ঝড়াকারা নিশীথিনীর বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও তেমনই হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই—যাহা কলাবিদের সৃষ্টির ভূমি হইতে দেখিবার বস্তু নহে। ইহাই সত্য হিন্দুর প্রাণের কথা ; যিনি ভাবুক, যিনি রসিক, এই রসসাধনা যাঁহার অন্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ তো নয়
তম তম করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটিক হয়।"

আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ কবি, সত্যদ্রষ্টা, তিনি সেই মিলনের উদ্দেশ্যেই বিভোর হইয়া আছেন।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কল্পকলা-সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাসলীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাম্য, এই যে সমদর্শন, ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবন্মুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য, ত্যাগের বিরাট ভাবও তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাঁহার কেন্দ্র, সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বর্তিয়া। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেমরাগিণীতে সকলকে মোহিত করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন, তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—

"রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা
কহে চণ্ডীদাস পূরিষেক আশ
তবে তো খাইবে সুধা।"

এই বিশ্বসৃষ্টির রস-মাধুর্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব-প্রাণের অন্তরভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে মিলনভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহামিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ্ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, এবং বিশ্লেষণ ভাঙিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্বস্বধন। সেই প্রেমের দেবতা পরিপূর্ণ, সবল, সহজ, সরল, সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাঁহার! কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ-চিন্তা-মণির 'মণি-কোটা'র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সেই প্রাণের সে অতল-স্পর্শ রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, 'ছেঁদো কথায় ভুল না,' তাহার মানে তো সকলেই বুঝেন! কবিতার ছন্দ, তাল সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির সাক্ষাৎকার মিলিবে ; এমত তো নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য। পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপ্সা ঠেকে। ভাষাও তেমনি কোন সুন্দরভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল, নিখুঁত, সুন্দর ও সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্যকে বাড়াইবার জন্য , অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব করা হয়, তাহার রূপের জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ মাত্র। পর্বতের গায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে ঝরনা যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতে মহীয়ান্ , জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবকশিখা। মানব-জীবন সেই শিখার জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রঙ ও রঙের মিলন-মাধুর্য।

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্তু ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরে যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপচিন্তামণির অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া

তোলাই কল্পকলার শেষ রঙ্গের খেলা। এই যে দেহ, মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নামই রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া উঠে। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিসকেই এই অন্তরের দিক্ হইতে দেখিলেই এই রূপান্তরে পৌছানো সহজ হয়। শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত আসে, সেই অনন্তমুহূর্তে এই রূপ-রাগভরা শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে, যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভ-মুহূর্তের জন্যই সকল কল্পকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্তে সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত, 'মুখরিত', বিকশিত, সৌন্দর্য-লীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশ্ব-আত্মার সমান খেলা। সকল জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্য রূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ,—সেই জগতের ও তাহার এক নাড়ী,—তাঁহার এক বিরাট হৃদয়। সেই বিরাট হৃদপিণ্ড এই বিরাট প্রাণসমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে শাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে।

বাঙালির গীতিকবিতা, দ্বিতীয় কল্প (অংশ)

আজিকার এই সাহিত্যের দরবারে আমি পুরানো কথাটিই আবার বলিতে আসিয়াছি। গীতি-কবিতা কি? গীতি কবিতার প্রাণই বা কি? গানের প্রাণই বা কি? কেন না, বাঙালা দেশে যাহাকে পদাবলীসাহিত্য বলা হয়, বা তাহার পরে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের ধারায় যে সকল পদ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলগুলিই সুরে গান হয়। আমাদের গান ও বিলাতি গীতি-কবিতায় কিছু পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য না বুঝিলে দেশের প্রাণের সঙ্গে ঠিক পরিচয়লাভ হইবে না।

বিলাতি গীতি-কবিতায় কবি বিশ্বের সকল পদার্থকে তাঁহার বুকের ভিতর টানিয়া লন। তাহাই প্রাণের ভাব রসে সিঞ্চিত করিয়া প্রকাশ করেন। সে প্রকাশে তাঁহাদের নিজত্বের ছাপ দিয়া দেন। তাহাতে হয় এই যে, প্রত্যেক রূপই কবির নিজের ভাবের ছাঁচে গড়া হয়। যে কবির আত্মায় সমস্ত বিশ্বের এই রূপ প্রতিভাত হয়, আর তাহা কবির মনের রূপের ছাঁচে গড়িয়া উঠে, সেই কবির কার্যই এই গীতি-কবিতা ; কিন্তু এই যে গীতি-কবিতা, ইহা আমাদের দেশীয় নয়।

আমাদের দেশে চণ্ডীদাস হইতে রামপ্রসাদ ও কবিওয়াল রা কেহই এই গীতি-কবিতা লেখেন নাই। তাঁহারা রচিয়া গেছেন গান, সেখানে আমরা কবিকে দেখি দ্রষ্টা। দুজনের প্রাণের খেলায় দর্শক হইয়া আনন্দরস ভোগ করিতেছেন। সেই আনন্দের সুরের রসে সব কথাগুলি ভিজানো মানুষের যে প্রাণের প্রকৃতি, সে যে। পাঁজর ভেদ করিয়া স্বাভাবিকভাবে পাখির গান গাওয়ার মতো গলা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাই হইল—বাঙ্গালার গীতি কবিতার বা গানের প্রাণ। সেই জন্য আমি বলিতে চাই, বাঙ্গালার প্রাণের। ভিতর হইতে গানই বাহির হইয়াছিল, ইংরাজি-প্রমুখ যে বিদেশী সাহিত্য আমাদের দেশে আমদানী হইয়াছে, তাহাবই ফল এই বিলাতি গীতি-কবিতা। এ ধারা বাঙ্গালার নিজস্ব নয়। মনকে, চক্ষুকে, প্রাণকে ঠিক ওই বৈদেশিক শিক্ষার ছাঁচের ভিতর দিয়া না লইয়া গেলে, ও গীতি-কবিতার ধারা সম্যক্ উপলব্ধি হওয়া দুষ্কর। গীতি-কবিতায় থাকা চাই,—তাহার ভাবের একান্ত-রস আর সেই রসের একটি পরিপূর্ণস্বরূপ ফুটাইয়া তুলাই তাহার কাজ। যেখানে সেই রসে খুব গাঢ় ও খুব অল্প কথা বা ভাবের দ্রুতকম্পনের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইবে, সেইখানে গীতি কবিতার সার্থকতা। সেই ভাবের ও রস সৃষ্টির মুহূর্তে যখন কবি তাঁহার নিজের আত্মায় প্রতিফলিত আসল রূপের স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখনি তাহা রূপান্তরে পরিণত হয়। আমরা আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই জিনিসটি পাই না ; এ কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। কিন্তু গান যখন আসে, তখন সুর ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কথা, শুধু সেই রূপকের—সুরের সেই রূপকে ফুটাইতে সহায়তা করে। সেইখানে সুরের সঙ্গে রসিক কবির আত্মার স্বানুভূতি জাগে, পরস্পর নিজের মাধুবী আস্বাদন করে, তাহাতেই সুর ও কথা আপনিই আসে। যে গান রসের সৃষ্ট মূর্তিকে সুরের রূপে ঢালাই করিয়া দেয়, সেই গানই বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি। ইংরাজি গীতি-কবিতায় ভাবের যে দোলন বা গতি প্রকাশ অধিকাংশই কবির মনের গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাঙ্গালা গান তাহা নয়, তাহার গতি আত্মার আপনার নিজস্ব। তাহার সুরের ও ভাবের মাদকতা

জাগে, সেই উন্মত্ততায় সে গানের ধারা সৃষ্টি করে। ইহাই সেই 'সাধিতে নিজ মাধুরী।' আমাদের দেশের মেয়েলী-ছড়া, গাথাকে গীতি-কবিতার স্তরে ফেলা যাইতে পারে বটে, তবে তাহার ছাঁচও বস্তুর নিজের সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবির প্রাণের ছাপ নাই, বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় সরস থাকে। এই বিলাতি গীতি কবিতার আমদানীতে আমরা ঠিক নিজেদের রাখিতে পারি নাই। আমাদের আত্মস্থ হইবার পথে, এই পথ—এই ছাঁচ প্রকাণ্ড অন্তরায়। কেন না, বস্তুর সহিত ইহা আমাদের সম্যক্ পরিচয় করাইয়া দেয় না। একটা কুহেলিকাময় আবরণের ভিতর আমাদের যে নিশ্বাস, তাহা রুদ্ধ হইয়া আসে। এই যে ভাব, ইহা সত্যও নয়, অসত্যও নয়, জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, এই এক অদ্ভুত অবস্থায় আধুনিক গীতি-কবিতা দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মাটির রসের সঙ্গে সেই দেশের মানুষের দেহের ও মনের রসের একটা অন্তরের মিল আছে। সেই রসের টানে, সেই রসের আবেশে যে মূর্তি সৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার দেশের প্রাণের পরিষ্কার নিখুঁত পরিচয় করাইয়া দেয়। বিলাতি Lyric-এর আর একটা দিক্ আছে, তাহাতে অনন্তের দিক দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু অনন্ত দুইটা হয় না ; আপনাকেও দেখাইব, অনন্তকেও দেখাইব, তাহা হয় না। কল্পনা যেখানে মূক, মানুষ সহজেই সেখানে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। একটা কোন স্বচ্ছন্দ পরিষ্কার প্রাণের অনুভূতির কোন রেখাও পড়ে না ; কোন রূপের দ্বারাও পকাশ করিতে পারে না। বাঙ্গালার কবিতায় চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদের যুগে, কি কবিওয়ালাদের সময়েও এ ভাব তাঁহাদের গানে কখনও আনেন নাই। তাঁহারা প্রাণের সঙ্গে প্রাণারামের সাক্ষাৎকার না করিয়া কোন কথা কখনও কহেন নাই।

তাই সেই বাঙ্গালার গান মানুষের জীবনের ধারায় সাধনের পথে আত্মার প্রতিধ্বনি ; সে যেন রাগে-সুরে মাখামাখি করিয়া তন্ময় হইয়া দুলিয়া উঠিতেছে। আবার সেই আত্মার গভীর নিগম দেশে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রাণের ভাবগুলাকে গলাইয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও যেন গলিয়া রস-নির্ঝরধারায় ঝরিয়া পড়ে। তাহাই আবার সুরের রঙে, ভাবের রঙে রঙিন হইয়া, এক নূতন জ্যোতির্ময় ধ্যানলোক সৃষ্টি করে, সেই ধ্যান-লোকেই কাব্যলোকের রূপান্তরের অনুভূতি হয়।

প্রথম কথা, আদর্শ কি? কাহাকে বলে? আদর্শ সেই পরিপূর্ণ রসের আকর লীলামৃত সুন্দর অনন্তশক্তির আধার শ্রীভগবান্। তিনি নিজেতে অধিষ্ঠিত— স্বাধীন, সেই জন্য অনন্ত। লীলার মধ্যে যিনি বিশৃঙ্খলাকেও সুশৃঙ্খলায় লইয়া আসেন, সেই চিদ্‌ঘন-আনন্দ-সুন্দর পুরুষ জড় ও জীবের যিনি আশ্রয়, লতা-গুল্ম, পশুজীবন, মানবজীবন, গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্যলোক, মহাব্যোমে অনন্ত-কোটি নক্ষত্ররাজী যাঁহার খেলার বদ্বুদ, যিনি প্রতিরূপেই স্বপ্রকাশ, তিনিই এই বিশ্বের আদর্শ। তিনিই সুন্দর, তিনিই কল্যাণ, তাঁহার সৃষ্ট, অনন্ত রূপই সুন্দর এবং সব সৃষ্টিই সেই জন্য সুন্দর। যেখানেই তাঁহার সুন্দর রূপের প্রকাশ হয়, সেইখানেই উজ্জ্বল বিভার আলোকচ্ছটায় সৌন্দর্য শতগুণেই ফুটিয়া উঠে। স্বপ্রকাশ স্বাধীন আত্মার যে অনুভূতি ও সৃষ্টি, তাহাই কল্পকলার রূপসৃষ্টি। আর যে রূপের অনুভূতির আদর্শ ও রূপের অঙ্গাঙ্গিভাবে পূর্ণ সরস হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। সেই মুহূর্তেই আমরা চিদানন্দ-ঘন-রসের স্ফূর্তি যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অনুভব করিতে পারি। সৌন্দর্য সেই জন্য সকল রকমের স্বাধীনতাব উপরই ফুটে। জীবনের সাধনার ধারায় যখন মন-প্রাণ-দেহের সর্ববাধা-বন্ধনবিহীন ভাবে আবেগে অনন্তের দিকে মুখ তুলিয়া চায়।

প্রাণের ভিতরে সেই অনুভূতি যখন দেহ-মন-প্রাণে একাঙ্গীভূত হয়, তখনই জীবনের রূপান্তর। এ রূপান্তর বুদ্ধের জীবনে হইয়াছিল, যখন বুদ্ধ মহাতপস্যার পর গেহকারককে নিজের ভিতরেই চিনিতে পারিলেন। এই রূপান্তর—চণ্ডীদাসের জীবনে হইয়াছিল, যখন তিনি তিমির

অন্ধকার পার হইয়া সহজকে জানিলেন, যখন প্রাণের অনুভূতির কষ্টি পাথরে 'বিষামৃতের' একত্রে মিলন-রেখা, মরমের দাগে সোনার নিকষের মতো দাগ দিল। রূপান্তর মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল, যখন সব ঠাঁইয়ে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফুরণ হইতে লাগিল। এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল, যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন, অবোধ বালকের মতো মায়ের নিকট আবদার করিতেন, কখনও বা তাঁহাকে গালি দিতেন। এই রূপান্তর শ্রীরামকৃষ্ণেও ফুটিয়াছিল। রামপ্রসাদের সাধনা রামকৃষ্ণের ভিতর যেন জীবন্ত রসমূর্তিতে মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই যে মানুষের জীবনেব ধারায় সাধনাঙ্গের একটা সহজ দিক্ আছে, সেই রূপের পর রূপের অবিরাম রূপস্রোতে অনুভূতি ও সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ নিজেকে চিনিয়া ফেলে ; অমনি রূপের আসল রূপ ধবা যায়।

বাঙ্গালাদেশের এই যে গানের ধারা—এই যে কল্পকলার ধারা, যাহাকে জীবনের সাধনাঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হয়, কেন না, বাঙ্গালা দেশ সাধন ধর্মের উপরই সকল কর্মের—সকল সৃষ্টির—সকল কল্পকলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া ধর্মের যে সহজ সরল আদর্শ আমাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠে, সেই আদর্শ ওই রূপের মধ্যেই চিত্রে, সুরে, কথায় নানারূপের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ হয়, যেমনই প্রাণে অনুভূতি হয়, অমনি রূপ-সৃষ্টি। এমন করিয়া রূপের পর রূপ, মূর্তি, স্রোতের মতো লীলাচাঞ্চ ল্য বারিধি-বুকে লহরে-লহরে দুলিয়া উঠে। সেই লীলাতরঙ্গের যে দোলনা-রেখা, সেই রেখার লীলার মধ্যে আমিও একটা রেখা, আমার সেই তরঙ্গ, আমার সেই দোলন, আমিও সেই অনন্ত লীলামৃতের মধ্যে রস-রেখায় রসিয়া আছি। আমি কখন এক, কখন বহু , আবার এই এক ও এই বহুর মাঝে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি। দোল চলিয়াছে, খেলা চলিয়াছে, আমি 'জন্মনি-জন্মনি' আমার দেহ-মন-প্রাণ দিয়া এই রস-সাধন করিতেছি। সেই রস সাধন যেমন আমার ধর্ম, সেই ধর্মের অনুভূতির সঙ্গেই আমার যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বানুভূতি, তাহা হইতেই আমার কল্পনার সৃষ্টি। তখনই প্রাণের ভিতর আদর্শের পরিপূর্ণ রসানুভূতি হয়।

বাঙ্গালা দেশের গান ও চিত্রে সেই অধ্যাত্মসাধনের রূপ ও রূপান্তরই ফুটিয়াছে, তাই আমি সেই গান ও সেই গানের চরিত্রের ধারায় বাঙ্গালা দেশের স্বরূপকে দেখিতে পাই।

রূপান্তরের কথা

রস বিচারের বিষয় নহে, অনুভূতির বস্তু। কল্পনায় যাহার উন্মেষ, সত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা, জীবনে তাহার চরম অনুভূতিই জীবনের ধর্ম, কল্পকলা সেই রসের অনুভূতিকে রূপের আশ্রয়ে প্রকাশ করে। বিচিত্র রূপে, বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, সুরে, মহাভাবের আবেশে কি আভা যে, মানুষের জীবন-কুঞ্জে তাহাব স্ফূর্তি হয়। এই জীবনের রূপ ও রঙের খেলার মাঝে প্রাণ-নিকুঞ্জে যে দিন বাঁশি বাজিয়া উঠে, সে দিন সে মুহূর্তেই সুন্দর মধুর রূপে বিশ্ব ভরিয়া যায়, আর অনেক দিনের অন্ধকারের অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়ে। জীবনের এই যে অনেক দিনের জড়তা, তাহা নির্বিষ খোলসের মতো পড়িয়া থাকে ; বিশ্ব-প্রকৃতি মধুররূপে হাসিয়া চায়। এক আত্মা মহা-ইন্দ্র-সম সহস্র কটাক্ষে দেখে, জগতে সুন্দর-কল্যাণ, মধুর-মঙ্গল গ্রহ-নক্ষত্র, ঋতু-কাল-মাস-বর্ষ, তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ-লতা, নদ-নদী, শ্যামায়মান প্রান্তর, অভ্রভেদী হিমালয়, তরঙ্গ-চঞ্চ ল বিশাল সাগর সেই একই রূপের রূপবৈচিত্র্যে আপনার আত্মবিকাশ করিতেছে।

বাঙ্গালার গীতি-কবিতায় আমি সেই আত্মবিকাশের কথাই বলিয়াছিলাম। সেই রূপান্তরের কথা, সেই রূপ হইতে রূপে বিলাস-বিবর্তের কাহিনী, সেই মহাভাবের সাধনা, সেই সার্বভৌমিক কল্পকলার প্রতিষ্ঠার কথাই কহিয়াছিলাম।

যে আলো লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে আলোক যে আমার প্রাণে জাগিয়াছে। মরমের 'মণিকোটায়' নিজের যে লুকানো আলোক জ্বালিয়া উঠে, তাহাকে তো চাপিয়া রাখা যায় না। আত্মা যে আপনার বিকাশ আপনি আপনিই করে। তাই সেই প্রদীপ হাতে করিয়া ঘবে ঘরে প্রাণের দুয়ারে-দুয়ারে সেই নিবানো দীপগুলি জ্বালাইয়া দিতে চাই। আমি কানে যে সুর শুনিতেছি, সে সুর আমার দেশবাসীকে আমি শুনাইতে চাই। যে প্রদীপে আমার প্রাণ জ্বালিয়াছে, সে প্রদীপ আমার বাঙ্গালার ঘরে-ঘরে জ্বালাইতে চাই। বাঙ্গালা আপনার আত্মবিকাশ আপনি করিবে, আপনার গান আপনি গাইবে, আপন সাধন দ্বারা সেই সিদ্ধি লাভ করিবে ও আপন গৌরবে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে। আমিই দেখিব, আমাদের ঘরে-ঘরে সেই প্রদীপ জ্বালিতেছে ; আমবাই শুনিব, সেই বাঁশরি কত বিচিত্র রাগিণীতে বাজিতেছে। তোমার প্রাণের উজ্জ্বল ধ্রুবতারাবে লক্ষ্য করিয়া চল, দেখিবে, তোমারই অকর্ষণে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুবিতেছে ; দেখিবে তোমারই-আলোকে চন্দ্র-সূর্য আলোকিত হইয়াছে। চাই শুধু—প্রাণের আন্তরিকতা, চাই শুধু—জীবনকে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করা, চাই শুধু—আত্মার দীপ হাতে করিয়া প্রতি পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে পথ চলা।

আমি শুনিয়াছি, আমার কথাগুলি নাকি অনেকে বুঝিতেই পারেন নাই। আজ আমি সেই কথাগুলি আরও ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমার বাঙ্গালা কেমন করিয়া সুখে-দুঃখে সোহাগ-আবেগে নিত্য নূতন হইয়াছে, বিচিত্র হইয়াছে, রসের সঙ্গে রসের মিলন ও বিরোধে কেমন করিয়া মরা বাঙ্গালী গান গাইয়াছে, তান তুলিয়াছে, সেই গানেব কতটা খাঁটি. কতটা মেকি,

তাহারই কথা বলিয়াছিলাম। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার গীতিকবিতার ধারা কেমন করিয়া বহিয়াছিল, মহাপ্রভুর জীবনের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার অপূর্ব বেগ ও স্ফূর্তি হইয়াছিল, কেমন করিয়া আবার সেই ধারা, মহাপ্রভুর পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় কি আকার ধারণ করিয়াছিল, আবার সেই ধারাই কবিওয়ালাদের গানের মধ্যে কেমন করিয়া মধুর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর মতো বহিয়া গিয়াছিল— সেই গীতিকবিতার ছবি আঁকিতে আঁকিতে ও সেই ধারাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য 'রূপান্তরের' কথা বলিয়াছিলাম। আজ আমি সেই রূপান্তরের প্রাণধর্মের কথা শুনাইতে চাই।

কিন্তু সাধারণ জ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের তর্কবিতর্কের ঘোর মোহজাল রচনা করিলে নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইতে হয়। যাহা চাই, তাহাকে প্রাণ ভরিযা বুকের ভিতর টানিয়া লওয়া সহজ,—শুধু তর্কে তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। জীবনের রসানুভূতির ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে হয়। আপনার প্রাণের মধ্যে চাহিযা থাকিতে হয়, তাহাদেব সঙ্গে স্নেহ চাই, ভক্তি চাই, প্রেম চাই। তাহা না হইলে, যাহাই বলি না কেন, যত তর্কই করি না কেন, যাহা চাই, তাহা কিছুতেই মিলে না। এই তর্ক-যুক্তি কথা-কাটাকাটিতে যাহা পাওয়া যায়—ইহা বাহ্য! তাই মীরাবাই গাইয়াছেন—

"বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা"

আমি দাশনিক নহি, বিজ্ঞানবিদ্ নহি,—আমি প্রাণধর্মের ধর্মী। আমি সেই প্রাণ-চিন্তামণির আলো লইয়া ঘুরিতেছি— সেই কাব্যলোকের কথাই বলিতে চাই। রূপান্তরের কথা সেই কাব্যলোকের কথা। সে কাব্য-লোক প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে। সে লোক যে মধুব উজ্জ্বল। জীবনের ধারায় প্রাণকে খুঁজিতে খুঁজিতে, যে দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই মুহূর্তেই রূপান্তর হয়। আমার এই প্রাণ যখন জাগরিত হইয়া মহাপ্রাণের আলোকে নিজেকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া তুলে, সেই মুহূর্তেই আমার নিজের সত্য পরিচয়-লাভ হয়। সেই কথাই রূপান্তরের কথা,—ইহাই প্রকৃত কবিতার কথা।

কথাটি আরও বুঝাইয়া বলিতে হয়। একটি ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, মনের সাধারণ অবস্থায় শুধু চক্ষু দিয়া দেখিলে একটি রূপ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সেই রূপ কি ফুলের প্রকৃত রূপ, সমগ্র রূপ? ফুল কি শুধু এক দিনে এক মুহূর্তে ফুটিয়া উঠে? তাহার মধ্যে কি জন্মজন্মান্তরের কাহিনী লুক্কায়িত নাই? কত কাল ধরিয়া সে যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছিল—কতবার ঝরিয়া ঝরিয়া আবার ফুটিয়া উঠিল! কে তাহা গণনা কবিবে! তাহার রঙেব প্রতিরেখায় যে অনন্তকালের ছাপ, তাহার প্রত্যেক পাপড়ির মধ্যে যে অনন্তকালের সুখ-দুঃখ জডাইয়া আছে, তাহার প্রত্যেক কাঁটার মধ্যে যে অনন্তকালের বিরহবেদনা জাগিয়া আছে। ফুল তো শুধু ফুল নয়, সে যে সকল বিশ্বের মহাপ্রাণ, তাহারই প্রাণকণিকা সে যে অনন্ত লীলাময়ের লীলা-সহচর! তাহার মধ্যেও যে বিশ্বরূপ জাগিয়া আছে। সকল বিশ্ব যে প্রাণময়, সকল রূপ যে চিন্ময়! সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সে একমেবাদ্বিতীয়ম্! সকল জীবজন্তু, তরু, লতা, সকল পদার্থ—যাহাকে তুমি অচেতন ভাবিয়া হেয় জ্ঞান কর, সবই যে সেই এক মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত, সবই যে একই চিন্ময়, অনন্তরূপে উদ্ভাসিত! ফুলও অনন্ত! তুমিও অনন্ত! তুমি যদি তোমার মনগড়া সাধারণ জ্ঞান কি বিজ্ঞানের ঠুলি চোখে পরিয়া ফুলের এই অনন্ত রূপ না দেখিতে পাও, তাহাতে কি ফুলের স্বভাব, কি ধর্ম বদলাইয়া যাইবে?

শুধু চক্ষে যাহা দেখি, তাহা ফুলের সাধারণ রূপ। আবার সেই ফুল, যখন আমি তাহাতে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া প্রাণ দিয়া দেখি, যখন সেই ফুলটি আমার ধ্যানধারণার বিষয় হইয়া উঠে, আমার রস-সাধনার মূর্তি হইয়া জাগে, তখনই তো আমার প্রাণের সাক্ষাৎ লাভ করি। তখন দেখিতে পাই, আমার প্রাণ যে অতল অনন্ত, আর আমার ফুল যে আপন গৌরবে তাহার বিশ্বরূপে, চিন্ময়রূপে, অনন্ত হইয়া আমারই প্রাণের মধ্যে ফুটিয়া আছে! তাহার সঙ্গে রসের লীলা চলিতেছে—তখনই রূপান্তর।

আমাদের সকলের জীবনেই এইরূপ রূপান্তর ঘটে বা ঘটিতে পারে। একটি নারী-মূর্তি দেখিয়াই প্রথম প্রেমের উন্মেষ হয়। প্রেম জাগিবার আগে সেই নারীর যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাই কি তার যথার্থ রূপ? অনুরাগের অবস্থায় যখন তাহাকে দেখি, তখন যে প্রাণ দিয়া দেখি! তখন যে আমার প্রাণকে দেখিতে পাই এবং সেই প্রাণের যে চক্ষু সেই চক্ষু, দিয়া তাহাকে দেখি! তখন যে—

স্রোতে ভাসা দেহ-মন তরঙ্গ-মুরতি
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে-পঞ্জরে!

যতই আমারা প্রাণের সাক্ষাৎ পাই, ততই যে মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠে! অনুরাগ গাঢ় হইলে—

আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ!

তার পরে সেই মূর্তি যে আমার ধ্যান-ধারণার বিষয় হইয়া পড়ে!

সেই—সেই তরঙ্গিত পরান-মুরতি
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি।
সকল লাবণ্যে গড়া রূপে ঢল ঢল
পরান-তরঙ্গে সেই স্থির শতদল!
সঘন গগনে থির চপলার মতো
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত!
সকল রকম মাঝে সব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায়!—
সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়,
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায়!

তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেই শুভক্ষণে তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সে যে আমার মাহেন্দ্রক্ষণ—সেই মুহূর্তই যে আমার জীবনের অনন্ত মুহূর্ত! আমি আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহারও সাক্ষাৎ পাইয়াছি!

সেই যে মুহূর্ত মোর, তুমি মূর্তি তার
নহ মিথ্যা! সত্য তুমি! সত্যরূপাধার!

অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর
রূপ-রস-গন্ধ-ভরা আত্মার মন্দির!
পদতলে কলকলে কাল ঊর্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা!

তখনই মনে হয় যে, এই প্রেম যে অনন্তের পথে যাত্রা করাইয়া দিয়াছে। একটা অপূর্ব শুদ্ধ পবিত্রভাবে প্রাণমন ভরিয়া যায়। মনে হয়, কোথায় কাহাব সন্ধানে চলিয়াছি। যাহাকে দেখিয়া প্রেমের উন্মেষ হয়, সে যে কোন্ মহাদেবতার জাগ্রত জীবন্ত বিগ্রহ। কাহার উদ্দেশে অভিসার করিয়াছি, কোন্ মহাসাগরের দিকে আমার জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে! তখনই বাঞ্ছিতকে বলি,—

রাখ বুকে বুক কর গো হৃদয়ঙ্গম
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর-সঙ্গম
পানে বহে চলিয়াছে, কার পিছে পিছে
শুনি কার শঙ্খধবনি—

তার পর এই প্রেম যখন আরও গাঢ় হয়, তখন প্রাণেব দুইটি তীর ভাসাইয়া দেয় এবং সেই স্রোতের মধ্যে কত কি জাগিয়া উঠে! তখনই গাহিয়া উঠি,—

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা
যে দীপ জ্বালেনি ওরে! সেই দীপ জ্বালা
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল বুলায়ে রঙ্গে?—
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা।
এই যে হৃদয়-মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে!—
যে দীপ জ্বলেনি আগে
ওরে! তারি আলো জ্বালা!

তার পরেই মনে হয়, এই যে প্রেমের খেলা, এ যেন তিন জনের খেলা—এক জনের লীলা। সেই এক জনেব চরণ-নূপুরের রুনুরুনু প্রাণের মধ্যে শুনিতে পাই। সে যে হাসিয়া হাসিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া আমার প্রাণের মধ্যে নাচে। এই প্রেমের যত না মাধুর্য সবই যেন নিজে আস্বাদ করে। আমরা যেন তাঁহাব পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার আনন্দ-মন্দিরে তাঁহারি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিই। তখন আমাদেরও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। তখনই প্রেমিক গাহিয়া উঠে,—

ওবে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে,
হৃদয়-কমল-মাঝে কি ধুম লেগেছে
* * *
কে নেয় রে মধু মিটি
হেসে হেসে কুটি কুটি?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি?

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধুম লেগেছে
পরান-কমল-মাঝে কি জানি জেগেছে!

যখন দেখিলাম, হৃদয়ের মাঝে 'কি জানি জেগেছে' পরেই দেখিলাম, 'কে জানি জেগেছে।' তখনই উপলব্ধি করিলাম যে, এ প্রেম ধন্য, তখনই আমার যে প্রেমের সহচর তাহার দিকে চাহিয়া গাহিয়া উঠিলাম,—

ওগো ফুল! ওগো মিষ্টি!
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি!
ধন্য আমি, ধন্য তুমি,
পুণ্য সে মিলন-ভূমি!

তখন যে আমার হৃদয়বিহারী করতালি দিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন, আমি আবার গাহিলাম,—

কে বলে রে ধন্য ধন্য?
কে দেয় রে করতালি?
.তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে?
কে বলে রে ধন্য ধন্য
এ কার নূপুর বাজে?
কার পদবজঃ
পরান-পঙ্কজ
শোভা করে?—

তখনই কি প্রেমিক তাহাকে দেখিতে পায়? তখনও নহে। এই প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন না কবিলে তাঁহাকে দেখা যায় না। এই প্রেম ব্রত উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। সকল জীব যে—

'ঠেকে গেছে প্রেমের দায়'

এক জন্ম হউক, অসংখ্য জন্ম হউক, এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইবেই হইবে। যখন সেই শুভক্ষণে প্রেমিক দেখিবে, তাহার চোখের কাছে প্রাণের মধ্যে, তাহার অন্তরে বাহিরে দুই বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাব হৃদয়ের হৃদয়বিহারী চিন্ময় চিদানন্দকে পূর্ণ আনন্দরূপ ঘন-বসামৃত-স্বরূপ তাহাবই প্রেমের প্রেমিক ভগবান্!

এই যে প্রেমের কতকগুলি অবস্থা নির্দেশ করিলাম, ইহার প্রত্যেক অবস্থাই রূপান্তরের অবস্থা, শেষ অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাই রূপান্তরের চরম। এই প্রত্যেক অবস্থাই সত্য, এই সমস্ত অবস্থা লইয়াই প্রেমের রাজ্য।

সেই প্রথম যখন রূপ আসিয়া চোখেব সামনে দাঁড়াইল, সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই শেষে যখন সকল রূপের যিনি স্বরূপ, তিনি আসিয়া প্রাণেব সম্মুখে প্রাণের মধ্যে দাঁড়াইলেন—এই সব লইয়াই যে প্রেম, এই সব লইয়াই একটি অখণ্ড সত্যরাজ্য। ভগবান্ যে বাঁশি বাজাইয়া তাঁহার নিকট ডাকেন। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইন্দ্রিযেব ডাকও সেই ভগবানের ডাক। ইন্দ্রিয়-জগতে যে প্রেমের আরম্ভ, অতীন্দ্রিয়-জগতে তাহার পরিণতি। ইন্দ্রিয়ের ধর্মই এই যে, সে আঙ্গুল দিয়া অতীন্দ্রিয়ের নির্দেশ করিয়া দেয়। এই যে অখণ্ড সত্যরাজ্য, ইহার কোন অংশই বর্জন করা যায় না,—করিলে সত্যের অঙ্গহানি হয়। এই সমগ্র সত্যটি যখন আমাদের

প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তখনই আমাদের সাধারণ জ্ঞানের যে প্রেম, তাহার রূপান্তর ঘটে। প্রেমের যে স্বভাব, তাহার পরিবর্তন হয় না, শুধু আমাদের চোখ খুলিয়া যায়, প্রেম আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে কবির প্রাণে এই সমগ্র অখণ্ড সত্যের প্রদীপ জ্বলিয়া না উঠে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন যে, কল্পকলার সাধনা এ জীবনে শুধু বিলাসের জিনিস, ইহার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা ধর্ম অর্থে ইংরাজেরা যাহাকে religion বলে, শুধু তাহাই বুঝেন। আমরা জীবনটাকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ভাগ করিতে শিখি নাই, আমাদের ধর্ম জীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আমরা জানি ও বুঝি যে, সকল কল্পকলার ভিত্তি রস-সাধন, সকল কল্পকলার উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। সুতরাং সকল রসের আকর যে রসময়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কোন রস-সাধনই সার্থক হইতে পারে না। রস-সাধন না হইলে রসসৃষ্টিও বিড়ম্বনা। বিলাসের ধর্মই এই যে, সে শুধু ইন্দ্রিয়-গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সে যে আপন বিলাসের বিষয় লইয়া তন্ময় হইয়া পড়ে ও আপনার আবেগে ইন্দ্রিয়রাজ্য অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয়রাজ্যে পৌঁছায় এবং সেইখানে তাহার রূপে-রূপে রসে-রসে বিলাসবিবর্ত! মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে এই বিলাসবিবর্তের কথাই শুনিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহারা শুধু ইন্দ্রিয়রাজ্যের যে বিলাস, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের খোঁজ পায় না, সেই রূপে-রূপে রসে-রসে বিলাস-বিবর্তের সন্ধান রাখে না, শুধু ইন্দ্রিয়রাজ্যের মধ্যে বিলাসকে আবদ্ধ করিয়া সেই বিলাস লইয়া একটা মন-গড়া অসার কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে কল্পকলার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহাদের আমি তর্ক করিয়া কিছুই বুঝাইতে পারিব না—শুধু বলিব, এই যে বিলাস, যাহার এক দিক্ দেখিতেছ, অপর দিক্ দেখিতে পাইতেছ না—ইহা বাহ্য!

আবার কেহ-কেহ বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রামের কথা তুচ্ছ নিম্নস্তরের কথা ; কল্পকলায় তাহার স্থান নাই। ইন্দ্রিয়ের বিষয় কল্পকলার বাজ্যে প্রবেশ করিলে কল্পকলা অপবিত্র হইয়া যাইবে, আমাদের ধর্ম নষ্ট হইবে। নীতির কথা বল, তত্ত্বের কথা বল, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে যাহা আছে, সব কাটিয়া ছাঁটিয়া দাও, ইন্দ্রিয়ভোগের যে স্পৃহা, তাহার নাম মুখে আনিয়ো না, মানুষকে দেবতা করিয়া তুল, কল্পকলার দোহাই দিয়া জীবনকে অপবিত্র করিয়ো না। জীবনকে অপবিত্র করে কাহার সাধ্য? জীবনের জীবন যে ভগবানের লীলা, সেই লীলাময়ের লীলার উপবে হস্তক্ষেপ করে, এমন অহঙ্কার—এমন দাম্ভিকতা কার? মানুষ কি এই পর্দাঘেরা নীতি-কথা বুকে বাঁধিয়া মিথ্যার উপর দাঁড়াইয়া মিছামিছি বিনাকারণে দেবতা হইয়া উঠিবে? মানুষের প্রবৃত্তি কি সত্য নহে? মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে কি ভগবানেব সাড়া পাওয়া যায় না? আজও কি চৈতন্যের দেশে এ কথা শুনিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের খেলা শয়তানের খেলা? আমরা কি ইংরাজি আমলের প্রথম অবস্থায় যাহা মুখস্থ করিয়াছি, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না? ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান মিলে না? ইন্দ্রিয় যে অতীন্দ্রিয়ের ভিত্তি, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়া একটা মন-গড়া শুদ্ধ পবিত্র লোকেব প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া যেমন, শূন্য আকাশে গৃহ-নির্মাণের চেষ্টাও ঠিক সেইরূপ! মিথ্যা কল্পরাজ্যে তাহা স্থান পাইতে পারে, সত্যরাজ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে যে, তাহার ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের যে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই? কাহারও প্রাণে সেই বংশীধ্বনি খুব স্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠে, কাহারও প্রাণে খুব ক্ষীণ ও অস্ফুটভাবে ধ্বনিত হয় ; কিন্তু একেবারে শুনিতে পায় না, এমন

হতভাগ্য কি কেহ আছে? যদি থাকে, তবে আমাকে বলিতেই হইবে যে, তাহার জীবনের কোন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। সে কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করিয়া বসিয়া আছে, জীবনের কোন সন্ধান পায় নাই। সে যেদিন সেই নিয়মগুলি ভুলিতে পারিবে, সে দিনই প্রথম সত্যরাজ্যে পদক্ষেপ করিবে। সে পর্যন্ত তাহার জন্য কোন কল্পকলার রসসৃষ্টির প্রয়োজন নাই। তাহাকেও আমি কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে পারিব না। যে দিন লীলাময় আপনি বুঝাইবেন, সে দিন বুঝিবে। এখন শুধু মহাপ্রভুর ভাষায় এইটুকু বলিয়া রাখি,—ইহা বাহ্য!

কেহ কেহ বলেন, মানুষকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাকে কাজের লোক করিয়া তুলিতে হইবে, সাধারণে যাহাতে তত্ত্বকথা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে, জনসাধারণে যাহাতে তাহার প্রচার হয়, কল্পকলার বিষয়কে এমন করিয়া গড়িতে হইবে। তাহাদেরও উত্তর—ইহ বাহ্য!

আবার কেহ কেহ বলেন, সমাজের সংঘাতে যখন ব্যক্তির জীবন দুর্বহ হইয়া উঠে, পরাধীন যখন তাহার শৃঙ্কলের ভারে নড়িতে পারে না, তখন কাব্যরস মানুষের প্রাণকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করে ; তাহাকে একটা স্বপ্নের ঘোরে লইয়া যায়। এই স্বপ্নের জন্য, জীবনকে এই স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারী করিবার জন্য কল্পকলার সৃষ্টি। তাহাবও উত্তর—ইহ বাহ্য!

কেহ কেহ বলেন, যাহা শুধু হিতকর, যাহা কোন অশুভ, ক্ষতি, কোন অমঙ্গল আনে না, তাহাই সুন্দর ও যথার্থ কল্পকলা। তাহাদেরও আমি বলিব—ইহ বাহ্য!

কল্পকলা যদি শুধু আমাদের আনন্দ ও আমোদের জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন ধর্ম থাকে না, তাহার আত্মবিকাশ হয় না, আমাদের কতকগুলা ভাবের খেয়ালের ছাঁচে পড়িয়া তাহার জীবনের আসল প্রাণটুকু মরিয়া যায়! তাহার কোন সার্থকতা হয় না। সত্য তখনই সুন্দর হয়, যখন তাহার এই বহিরাবরণের ভিতর ছাপাইয়া সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো ভাবকে বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়। মানব-প্রকৃতির গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশের যে প্রাণের খেলা, তাহাই যখন সে প্রকাশ করে, যখন আত্মার নিগূঢ় কথাটি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তখনই কল্পকলার রূপসৃষ্টি হয়। বিশ্বের অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার যাহা সাধারণ জ্ঞানে সাদা চোখে বন্ধ থাকে, মানবের সেই 'ভিতর গাঁয়ের' কথা,—কাম-কামনার অতীত যে মাধুর্য, সেই আত্মায় রসভোগের যে ব্যঞ্জনা, বিশ্বশক্তির যে মূর্ত স্ফুরণ, মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মায় আত্মায় যে রমণ, কল্পকলা তাহারই চাবি,— সেই চাবি ঘুরাইয়া আত্মা নিজের রূপের আদর্শটিকে সেই অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির করিয়া আনে।

বিশ্বের যে দিকে নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখি,— দেখি, প্রতি পত্রে, প্রতি রঙে, প্রতি রূপে সেই আত্মার প্রতিরূপ। ঋতু আবর্তন ও বিবর্তনে মানবের কার্যকারণের সম্বন্ধে, প্রকৃতির বিপ্লব-বহ্নিদাহে, মানুষের নিজকৃত স্বকপোলকল্পিত নানা শক্তির বিকাশে, এক মহা সুশৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলায় যেন এই বিশ্ব অহরহ আন্দোলিত হইতেছে। আঁখির সম্মুখে বাস্তব সত্য-জগৎ প্রতিভাত, কিন্তু তাহাতে সেই অন্তরতমের যে রূপ, তাহা আমাদের চোখে পড়ে না। কল্পকলা সেই অন্তরের রূপটিকে বিশ্বের বুকের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করে, যাহা মায়া বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার সত্যরূপকে জাগাইয়া দেয়। যাহা এমনি আমাদের চোখে পড়ে, যাহার ভিতর সেই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতের রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ হয় না, কল্পকলার সেই সত্যকে মনের কাছে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া ধরিয়া দেয়। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণের কাছে সেই সত্যকে আনিয়া দেয়। রূপে রূপে রসে রসে যে লীলা, তাহার ধ্যানগত অনুভূতিই

কল্পকলার বিভূতি। কল্পকলাবিদ্ সেই বিভূতি দর্শন করেন। যাঁহারা সত্যের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে পরানুরক্তিতে আসক্তি জাগিয়াছে, যাহাদের চিত্ত সর্বভাবে সেই পরানুরক্তিতে ভিজিয়া গিয়াছে, যাঁহাদের ভাব সেই রসের মধ্যে গাঢ়তা লাভ করিয়াছে, সেই প্রাণ-মন-দেহ দিয়া অনুধ্যান, সেই অহৈতুকী সান্নিধ্যলাভের জন্য যাঁহাদের প্রাণ প্রেমরসে বিভোর হইয়াছে, তাঁহারাই কল্পকলার স্রষ্টা।

মনের যে আকাঙ্ক্ষা, সে সত্য বস্তুকে সুন্দর করিতে চায়। শুধু তাহার একটা ভাবের আভাষে প্রাণ ভরিয়া উঠে না, তাহাতে সে তৃপ্ত হয় না। সেই রূপরসের ভিতর দিয়া মূর্তিকে ধরিতে চায়, তাহাতে দোষ হয় এই যে, বস্তু তাহার নিজের স্বাধীন ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। সে তখন আমার আকাঙ্ক্ষাব, কামনার ভোগ্য দাস হইয়া দাঁড়ায়। তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে বাধা পায়। তাই তখন আর সুন্দর থাকে না। বস্তুব যে নিজের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ও গতি আছে, তাহাই তাহার বিশিষ্ট সৌন্দর্য, আর সেই জন্যই তাহা সুন্দর। সে যে রস জাগাইয়া দেয়, তাহাই সুন্দর। তোমার আমার মনে যে রসেব অনুভূতি হয, তাহার সঙ্গে সেই বস্তুর রসাঙ্গসমূহ মিলিত হইয়া আমার প্রাণের কাছে এমন একটি রূপের দ্বারা রসের আভাষ জাগায়—যাহা সুন্দর—অতি সুন্দর!

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো জড় নয়, জড়তা আমার মনের মধ্যে, তাই এই চিন্ময় ধামের রূপ-মাধুর্যের ভিতর সুন্দরকে ব্যভিচারী দোষে দুষ্ট করিয়া জড় বলি। অঙ্গসমূহের যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে যাহার যথাযোগ্য সন্নিবেশে রূপসৃষ্টি হয়, আব, সেই রূপের ভিতর তাহার আত্মার মধুর রসটি জাগিয়া উঠে, তখনই তাহা সুন্দর। তাই সুন্দরের জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হয়। কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের প্রাণের রসেই তেমনই স্বাভাবিক ভাবের মিলন হওয়া চাই। যখন মনকে রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তখনই সুন্দর, সুন্দর হয়। এই সুন্দরকে প্রকাশ করিবার জন্যই কল্পকলাব সৃষ্টি। মানব-অন্তঃকরণের ভিতব যে ভাবরাশি ঘুমাইয়া থাকে, মানুষের মনে যে গভীর জটিল রহস্যগুলি লুকাইয়া লুকাইয়া আপনি খেলা করে, তাহার প্রাণের ভিতরে যত সঙ্কল্প-বিকল্প, যত তৃষ্ণা, যত দ্বৈতের জঞ্জাল, দৈন্য-বিবোধ, যত মিলন-সোহাগের মাধুর্য, তাহার বেদনা, তাহার যাতনা, তাহার রাগ-অনুরাগ, তাহার ভাব-অভাব, মহাভাব এই সব দিয়া আমাদের সমগ্র জীবনের যে অনুভূতি, জীবনচক্রের এই মহা-পবিধিব ভিতরে মানুষ যেমন করিয়া বাঁচে, যেমন করিয়া মরে,—এই জাগ্রত ভাবের রূপ ধবিযা সৃষ্টি করাই কল্পকলার উদ্দেশ্য। আর সেই রূপের ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দ-ঘন-চিন্ময় কেমন প্রতিরূপ হইয়া ভাঙা-গড়ার লীলা লীলায়িতভাবে আমাদের প্রাণ-মন-দেহ দিয়া সাধন করিতেছেন, তাহারই প্রকাশ করা, সুন্দর করিয়া তোলাই কলাবিদের প্রাণের সৃষ্টি-কাহিনী।

কেহ কেহ বলেন, কল্পকলার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টি অপেক্ষা হীন। কারণ, প্রকৃতিতে জীবন উদ্‌বুদ্ধ, মানবের সৃষ্টিতে তাহা মৃত, প্রকৃতিতে তাহা সজীব জীবন্ত! কল্পকলার উপাদান হয় কাঠ, নয় পাথর, নয় মাটি, নয় মোম, নয় কথা, নয় সুর। এ সব পদার্থও যে সত্য, মৃত নয়, ইহাদের মধ্যেও মহাপ্রাণ জাগিয়া আছে! কিন্তু শুধু এই সব উপাদান দিয়াই তো কল্পকলাব সৃষ্টি হয় না। আত্মার অনুভূতি দিয়া সেই সৃষ্টির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই অনুভূতিতে যে মহাজীবনের আভাস, তাই এই সব কাঠ-পাথর অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। জীবনের মধ্যে যে সত্য আমরা চোখের কাছে ধরিতে যাই, প্রকৃতির বুকে যে সব সৃষ্টি আমরা জীবন্ত বলিয়া দেখি, কল্পকলা তাহাই ধরিয়া নব নব রূপে জীবিত জ্বলন্ত সত্তার ভিতর দিয়া সৌন্দর্যের স্বরূপটি ধরিয়া দেয়। সেই জন্য

কল্পকলার সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু—ইহ বাহ্য! এ সকল কথা সার্বভৌমিক কল্পকলার কথা নয়। প্রকৃতি যে আদর্শে আপনার বুক হইতে রূপের সৃষ্টি করে, মানুষও সেই একই আদর্শে তাহার প্রাণ হইতে রূপ সৃষ্টি করে। এই উভয় সৃষ্টিই যে সেই লীলামৃত-রসাধার সেই আনন্দ-ঘন মহান রসরাজের লীলাভঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। কেহ হীন নয়, কিছুই হীন নয়।

কবীর গাহিয়াছেন—

"আপুহি সবমে রমা হৈ,
আপ সবনকে পার।
রূপ রংগ সব আপুহী,
আপুহী সিরজন হার॥
আগে বহুত বিচাব ভৌ,
রূপ অরূপ ন তাহি।
বহুত ধ্যান করি দেখিয়া,
নহি তহি সংখ্যা আহি।'

আপনি সৃজন করিয়া আপনিই হরণ করিতেছেন; সকলের ভিতরেই তিনি আছেন, সকল রূপের মধ্যেও তিনি। রূপ ও রঙের যে রঙ্গ যে লীলা, এর তো সংখ্যাসীমা নাই। জীবনে যাহাদের রূপের পরিচয় ভাল করিয়া হইয়াছে, তাহারাই এই রূপ-রঙের লীলা-মাধুর্য উপভোগ করিতে পারে।

অনন্ত রূপের মাঝে এ মন শুধু দু-একটা রূপকেই চিনিতে পারে, ধরিতে পারে, অসংখ্য সুরের হিন্দোলমাঝে একটি সুর হয় তো আমার চিনিতে পারি, অসীম জ্যোতিরাশির মাঝে আমরা যেন পতঙ্গবৎ উড়িয়া বেড়াইতেছি। কল্পকলার রূপের ধ্যানে যখন সমাধি হয়, তখন সেই আসল রূপটি ফুটিয়া উঠে। এই সাধনায় সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

যড়্‌দর্শনে দর্শন পেলেম না আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি-রসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥

কল্পকলার স্রষ্টা সত্য সত্যই এই রূপের ভিতর দিয়া দর্শন করে, স্পর্শ করে। সে মহাভাবের গান তাহার কানে অহরহ ধ্বনিত হয়। কলাবিদের প্রাণ সেই মহাপ্রাণের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আপনি বাজিয়া উঠে। এই বিশ্ব তাহার কাছে এক বিরাট্ আয়নার মতো ঝক্ ঝক্ করিতেছে, কলাবিদ্ সেই আরশিতে নিজের রূপের প্রতিরূপ দেখিয়া নিজ মাধুরী আস্বাদন করেন। প্রতিরূপের ভিতরেই তাঁহার বিলাস-বিবর্ত ফুটিয়া উঠে, তাঁহাব আত্মার রূপ বিশ্বের প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে, বিশ্বেব প্রাণের রূপ তাঁহার প্রাণে প্রতিভাত হয়। এই যে অন্তরে অন্তরে রূপের পরিচয় লাভ কবা যায়, তাহাই প্রাণের রূপান্তর।

আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালার আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই প্রাণে প্রাণে অনুভূতি, সেই "স্বাদিতে নিজ মাধুবী" প্রাণের সেই সার্বভৌমিক কল্পকলার রূপান্তর হয নাই। চণ্ডীদাসের গানে, রামপ্রসাদের গানে যে রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক কবিদিগের কবিতার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আছে। গীতিকবিতার প্রাণ কবির আত্মানুভূতিতে ও আত্মস্থ অনুরাগের আনন্দে। কবির প্রাণে জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গে যে রূপের পরিচয় কবি লাভ করেন, তাহার আত্মার নিগূঢ় কথাটি, মর্মটি প্রকাশ করিয়া তোলাই গীতিকবিতার ধর্ম। কথাটি অপ্রিয়

হইলেও আমাকে বলিতে হইবে, বাঙ্গালার আধুনিক গীতিকবিতায় সে জিনিসটি পাওয়া যায় না। এই যে শত বর্ষব্যাপী আমাদের আধুনিক সাহিত্য গীতিকবিতার বিরাট্ আয়োজন, ইহা আমাদের জীবনের কোন কর্মই, কোন সাধনাকেই সার্থক করে নাই, কোন সত্যকেই সুন্দর করিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে নাই। এ সেই—

"পিতলকি কাটারি কামে নাই অওল
উপর কি ঝক্‌মকি সার"

এই সমগ্র সাহিত্যই অনুভূতির নয়—মাথার বোঝা। ধার করা—পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহরণ করা। ইংরাজি সাহিত্যে ও ফরাসী কবিতার তর্জমা হয় তো বা নরওয়ে সুইডেনেরও ছাঁদে গড়া। তাহাতে বাঙ্গালীর প্রাণ নাই, ধর্ম নাই—আছে শুধু অনুকরণ। অনুকরণে কখন জীবন আসে না, ধার করিয়া কখনও সম্পদ অর্জন করা যায় নাই। এই সাহিত্যও সেই কারণে বস্তুহীন, প্রাণহীন, একটা অসার কাল্পনিক ভাবুকতায় ভরা। বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই।

রূপে ধরা দিবার জন্যই ভাব প্রাণের অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া উঠে। ভাব যতই রূপের ভিতর দিয়া স্ফূর্তি পাইতে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য বাড়ে। ভাব যখন সত্য সত্যই রূপের কাছে ধরা দেয়, তখনই তাহা মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন মানব-মনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব কাল্পনিক নহে, সত্যের অবভাস নয়, তাহা সত্যরূপ, তাহাই সত্য মূর্তিমন্ত জ্বলন্ত। সত্যের রাজ্যে নিত্য যে লীলা চলিতেছে, তাহাতে ভাব ও আকারের পার্থক্য নাই। সে লীলা কাব্যলোকের নিভৃত মিলন-কেন্দ্র। আমাদের বিচারবুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু মিলনমন্দিরে যখন বুদ্ধি সেই রূপের টানে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তাহার সেই পাটোয়ারি বুদ্ধি রূপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া মরিয়া বাঁচে, আর প্রাণ তখনই সত্যকে অনুভব করিয়া একেবারে গ্রহণ করে। যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর। যাহা সুন্দর, তাহাই যে অনন্ত, স্বাধীন। যাহা স্বাধীন, তাহাকে তোমার মাপের রশি দিয়া বাঁধিতে পারিবে না ; যাহা অনন্ত, তাহাকে তোমার মাপকাঠি দিয়া পরিমাণ করিতে পারিবে না।

তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায় প্রেম—অখণ্ড অনন্ত প্রেম। ভাব যেমন আপনার ভাবে গলিয়া আকারের ছাঁচে আপনাকে ঢালিয়া দেয়, তেমনি জীবনকে সেই প্রেমে ঢালিয়া দিলে তবেই জীবনের সত্য রূপটি ধরা দেয়। এই প্রেমের সোহাগ-বাঁধন যদি না থাকিত, তবে কি এই যে মহাভাবের অপার আনন্দ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি অনন্ত অভাব, অসীম দুঃখ—এই দুইকে মিলাইতে পারিতাম? যত দুঃখ, যত অভাব, যত যাতনা, যত ঘৃণা, যত হিংসা, সেই প্রেমেরই অন্যরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সবের মধ্যেই যে সোহাগের বাঁধন। এই সবই যে অনন্ত প্রেমের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। যখন সত্য হারাইয়া মেকি লইয়া প্রাণ কাঁদে, তখন সেই অনন্তের পানে মুখ তুলিয়া প্রাণ বাঁচে! জীবনের যদি কোন সংজ্ঞা থাকে, তবে তাহা প্রেম, প্রেমে এই মূর্তি-স্রোতের জন্ম, প্রেমেই এই প্রাণ-স্রোতের চঞ্চলতা। সারা বিশ্ব সেই প্রাণস্রোতে মূর্তির পর মূর্তি, রূপের পর রূপ, এই লীলা-চঞ্চল-বারিধি-বুকে অবিরাম প্রাণ-স্রোতে টলমল করিতেছে। সেই লীলা-চঞ্চল মুরতি-স্রোতের সঙ্গে প্রাণের নিঃসঙ্গ পরিচয়-লাভই প্রেমের এক দিক। রূপের ভিতর দিয়া প্রাণের এই লীলামূর্তির পরিচয় যখন ধ্যানগত হয়, তখন সেই মূর্তির সহিত অহৈতুকী পরিচয় হয়, তখন সেই নিজের মাধুরী সেই মূর্তিস্রোতের ভিতর আস্বাদন হয়। তখনই সত্য রূপান্তর। প্রেমের প্রথম জাগরণে রতির রাগানুরাগ জাগে, সেই জাগরণের সঙ্গে নিজের মাধুরী আস্বাদের

কামনা, বাসনা, মমত্ব, মদনত্ব জাগে। যখন তাহা প্রেমের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়?— সেই প্রেমেব ভূমিতে একবার পা রাখিতে পারিলে অখিল-রসামৃত মূর্তির আভাষ প্রাণে—স্ফটিকের সূর্যকিরণ-প্রতিবিম্বের মতো স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। প্রাণ যখন দর্পণের মতো স্বচ্ছ হয়, তখনই আত্মার যে প্রাণময় সৌন্দর্য, তাহার স্বরূপকে পাই। তখন বুঝিতে পারি! সে প্রাণের সত্য অনুভূতিতে, নিখিল রস, রসশেখরের রস-চঞ্চল যে সত্যমূর্তি, তাহাই প্রাণে ফুটিয়া উঠে। সেই ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের রূপকে সত্যদর্শন হয়, তাহাকে স্পর্শ করা যায়, তখন তাহার গায়ের গন্ধ নাসিকায় ভাসিয়া আসে—প্রাণ-স্রোতের লীলায় তখন সেই ধ্যানগত পদ্ম ফুটিয়া উঠে। কলাবিদের জীবনে, কবির জীবনে, এমনি করিয়া সেই সত্য পরিচয় হয়! কলাবিদ্ ও কবির রূপান্তর—তাহার দৃষ্টি তাহার প্রকাশ!—সাধক তাহার সাধনায় সমাধিতে—তাই মিলাইয়া আনন্দ-ঘন-রসে মজিয়া যায়! এই যে রূপান্তর, ইহা সেই অনন্তের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়লাভ — প্রাণে-প্রাণে বুকে-বুকে স্পর্শমণি ছুঁইয়া সোনা হওয়া!

আমি বলিতে চাই যে, একমাত্র চণ্ডীদাসের গান ছাড়া বাঙ্গালা গীতি-কবিতার শেষ যুগে রামপ্রসাদের গানে সেই রূপান্তর হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রাণের যে সৌন্দর্য, তাঁহার কল্পকলার যে সৃষ্টি, তাঁহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জীবনের মতো এত বড় কাব্য আর কখনও রচিত হয় নাই। সাধক রাম প্রসাদ যে রসের আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহার জীবনে যে ফুটিয়াছে, এ কথা এখন না-ই বলিলাম। চণ্ডীদাসের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল,—তাঁহার সৃষ্টিই তার প্রমাণ। রামপ্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহার সৃষ্টিও তাহারই প্রমাণ।

সাগরসঙ্গীত আখ্যা কবিতার দুটি ইংরিজি অনুবাদ

Unhoped for, wondrous one, ever elusive,
wait awhile that I weave thee in my song.
The calm sea lapped in dreams
Trembles to-day in thc pale light of the moon!
If it be that thou hast truly come,
Then, O smiling mystery ! dwell in my heart,
What time I weave thee into song!
Stay yet awhile,
And with the melodies of the sea and the free
Soundless shythm of my heart
I will thee enrythm in manner yet passing beyond
all shythm!
Bound then thou will be in the enduring solitudes
of my heart!
Wilt thou there not abide,
O thou with the circling robe of dream,
Held fast in that music and stay in thy fulfilment,
Eternal, Unmoving?

কবির নিজের করা অনুবাদ

O THOU Unhoped for elusive wonder of the skies,
        Stamd still one moment! I will lead thee and bind
        With music to the chambers of my mind.
Behold how calm to-day this sea before me lies
And quivering with what tremulous heart of dreams
        In the pale glimmer of the faint moonbeams.
It thou at last art come indeed, O mystery, stay
Woven by song into my heart-beats from this day.

Stand, goddess, yet! Into this anthem of the seas
        with the purestrain of my full voiceles heart
        Some shythm of the shythmless, some part
of thee wo ıld I weave to-day, with living harmonies
        peopling the solitude I am within.
        wilt thou not here abide on that vast scene,
Thou whose vague raiment edged with dreams haunts us
                                        and fleas,
fulfilled in an eternal quiet like the sea's?

একই কবিতার শ্রীঅরবিন্দ-কৃত ভাষান্তর

জীবনীপঞ্জি

১৮৭০	৫ নভেম্বর কলকাতায় জন্ম।
১৮৮৬	প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য।
১৮৯০	আই.সি.এস পরীক্ষা দিতে লন্ডন গমন।
১৮৯৩	ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ।
১৮৯৪	কলকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় শুরু।
১৮৯৬	*মালঞ্চ* প্রকাশ।
১৮৯৭	বিবাহ : ৩ ডিসেম্বব।
১৯০২	*মালা* প্রকাশ।
১৯০৫	স্বদেশী-মন্ডলী গঠন।
১৯০৭	বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার মূল পত্র-লিখন। দেশদ্রোহিতার মামলায় বিপিন পাল ও ব্রহ্মব্রান্ধব উপাধ্যায়কে সমর্থন।
১৯০৯	আলিপুব বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষকে সমর্থন। ডুমরাঁও মামলায় কৌঁসুলি।
১৯১০-১১	*সাগর সঙ্গীত* রচনা। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিনবিহারী দাসের পক্ষে সওয়াল।
১৯১৩	*সাগব সঙ্গীত* প্রকাশ।
১৯১৪	দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা। 'নাবায়ণ' পত্রিকা প্রকাশ শুরু। *অন্তর্যামী* প্রকাশ।
১৯১৫	*কিশোর-কিশোরী* প্রকাশ। 'নারায়ণ'-এ 'বাংলা গীতিকবিতা' প্রবন্ধ-প্রকাশ।
১৯১৭	বাংলা প্রাদেশিক সভার সভাপতি। ই. এস.মনটেগু, সেক্রেটারি অব স্টেটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বাঁদীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ। 'বাংলা গীতিকবিতা, দ্বিতীয় কল্প' নামে 'নারায়ণ'-এ প্রকাশ।
১৯১৮	আলিপুর ট্রাঙ্ক-হত্যা মামলা ও অমৃতবাজার মানহানি-মামলায় কৌঁসুলি।
১৮২১	আইন-ব্যবসা ত্যাগ। গ্রেপ্তার। আমেদাবাদ-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।
১৯২২	৬ মাসের জন্য কারাদন্ড। গয়া কংগ্রেসের সভাপতি।

১৯২৩	মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টি স্থাপন। বোম্বাইয়ে সারা ভারত কংগ্রেস-কমিটির চেয়ারম্যান।
১৮২৪	কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র। বাংলাব প্রাদেশিক বিধানসভায় স্বরাজ্য পার্টির নেতা।
১৯২৫	ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সভাপতি। ১৬ জুন দার্জিলিং-এ মৃত্যু।

কাব্য-পরিচিতি

মালঞ্চ	প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬। ১৯০৫-এ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। বাংলা ১৩১৯ (১৯১২)-তে পুনরায় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৭, গোয়াবাগান স্ট্রিট থেকে আর-একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন, 'অবকাশ-অভাবে মালঞ্চের ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। তা হউক—Good wine needs no bush'।
মালা :	১৯০২-এ প্রথম প্রকাশ। মোট একত্রিশটি কবিতা। ১৯১৫ তে শিশিরকুমার দত্ত ২৫, সুকিয়া স্ট্রিট থেকে পুনরায় প্রকাশ করেন। লেখকের নিবেদন : 'এই সবগুলি কবিতাই সাগর-সংগীতের অনেক আগে লেখা। দু-একটি মালঞ্চেরও আগে।' *কবি-চিত্তে* সংকলনের সময় অপর্ণা দেবী কবিতার ক্রমে কিছু হেরফের করেছিলেন।
সাগর সঙ্গীত :	রচনাকাল ১৯১০। ১৯১৩-তে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট থেকে আর্ট প্লেটে মুদ্রিত করেন। প্রতি পৃষ্ঠায় সমুদ্রের বিভিন্ন অবস্থার হালকা ছবি ছাড়াও কয়েকটি রঙিন প্লেট রয়েছে। সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত ৩৯টি খন্ড কবিতা নিয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা।
অন্তর্যামী :	১৯১৪-তে শিশিরকুমার দত্ত-কর্তৃক ২৫, সুকিয়া স্ট্রিট কোলকাতা থেকে প্রকাশিত। *সাগর সঙ্গীতের* মতোই শুধু সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত ছোটো-বড়ো ৪২টি কবিতার সংকলন।
কিশোর-কিশোরী :	১৯১৫-য় 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়। ১৯২৫-এ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বসুমতী কার্যালয় থেকে পুনরায় প্রকাশ করেন।
সাগর-সংগীত ও অন্যান্য কবিতা :	১৯২৫-এ এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, ৯০।২এ, হ্যারিসন রোড থেকে প্রকাশিত ও ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। সম্পূর্ণ *সাগর সঙ্গীত* ছাড়াও *মালঞ্চ* থেকে ৯টি, *কিশোর-কিশোরী*

থেকে আখ্যাপত্রের কবিতা-সহ কিছুটা, *মালা* থেকে ৫টি, *অন্তর্যামী* থেকে কিছুটা সংকলিত। প্রথম সংকলন গ্রন্থ।

দেশবন্ধু-গ্রন্থাবলী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-প্রণীত। 'গ্রন্থাবলী-সিরিজে' সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক বসুমতী-সাহিত্যমন্দির থেকে ১৯২৫-এ প্রকাশিত। পাঁচটি কবিতার বই ছাড়াও কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা ও গান সংকলিত। কবির কবিতা-বিষয়ক কটি প্রবন্ধ 'কাব্যের কথা' নামে, ঢাকা সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ 'দেশের কথা' নামে ও বিভিন্ন বক্তৃতার একটি সংকলন 'বক্তৃতাবলী' নামে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কবিতাব বইগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সময় রচনা বা প্রকাশের কালপর্যায় রক্ষিত হয়নি।

কবি-চিত্ত : ১৯৫৭-য কবিকন্যা অপর্ণা দেবী-সম্পাদিত কবির প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে প্রথম ও এখনও পর্যন্ত একমাত্র কাব্যসমগ্র। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে প্রকাশিত। উৎসর্গপত্রের লিখন : 'মা, বাবার কবিতাবলী সম্পাদন করে তোমারই হাতে তুলে দিলাম। অপর্ণা'

ইংবেজি-অনুবাদ Songs of the sea : (Sagar-Sangit) By C R.Das-Sri Aurobindo। সমসমায়িকদের লেখায় উল্লেখ থেকে মনে হয ১৯২৩-২৪-এ একই মলাটের মধ্যে দুটি পৃথক ইংরাজি অনুবাদ ছাপা হয়। কিন্তু এই প্রথম সংস্করণের কোনো কপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। ডিসেম্বর, ১৯৫৯-এ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে। তিনটি অংশে বিভক্ত এই বইয়ের ১-৪২ পৃষ্ঠায় কবির নিজের করা অনুবাদ, ৪৫-৮৫ পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের রূপান্তর এবং অবশিষ্ট অংশে মূল বাংলা কবিতার দেবনাগরী হরফে প্রতিলিপি।

কবিতা-নাম ও প্রথম পংক্তির সূচি

মালঞ্চ (১৮৯৬)

মালা (১৯০২)

সাগর সঙ্গীত (১৯১৩)

অন্তর্যামী (১৯১৪)

কিশোর কিশোরী (১৯১৫)

অগ্রন্থিত কবিতা ও গান :

লন্ডনে ছাত্রাবস্তায় রচিত (১৮৯২-১৯১৬)

১৯১০-১৯১৬ এর মধ্যে লিখিত গান ও কবিতা :